দেবাশিস আইচ

এনআরসি, জাতীয়তাবাদ ও গণবিপন্নতা

১৯৯৪ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়। তৎকালীন বরপেটা জেলার (বর্তমান বাক্সা) শালবাড়ি থেকে এলাঙ্গাবাড়ি, প্রায় কুড়িটা গ্রামের মানুষ জেনে গেলেন তাঁরা যে কোনও সময় আক্রান্ত হতে পারেন। গ্রাম ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে চললেন তাঁরা। নিরাপদ আশ্রয় বলতে বাহাবাড়ি রেঞ্জ অফিসের একটি মাঠ। আর একটি স্কুলবাড়ি। আর সেখানে রয়েছে একটি পুলিশ ফাঁড়ি বা ক্যাম্প। ক্যাম্প ইনচার্জ সহ গোটা ২৪ পুলিশ কর্মী। মাঠেই পড়ে রইলেন প্রায় হাজার দশেক মানুষ। শ'পাঁচেক মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার স্থান হল একটি এম ই স্কুলে।

১৯ জুলাই অন্ধকার নামতেই এলাকা ঘিরে ফেলল বোড়ো জঙ্গিরা। অভিযোগ, অতিরিক্ত ফোর্স পাঠানোর জন্য ক্যাম্প ইনচার্জের যাবতীয় বার্তা পত্রপাঠ নাকচ করে দিয়েছিল জেলা পুলিশ-প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তারা। অজুহাত, পাঠানোর মতো যথেষ্ট বাহিনী মজুত নেই। রাত দশটা, পুলিশ বাহিনীকে গুলির লড়াইয়ে হারিয়ে দিয়ে এলাকার দখল নিল জঙ্গিরা। স্কুলের তিনটি দরজা বেঁধে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় জঙ্গিরা। তারপর মাঠ লক্ষ করে খালি করে দেয় স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের ম্যাগাজিন।

মৃত? আহত? সঠিক সংখ্যা বলা মুশকিল। তবে তৎকালীন হিতেশ্বর শইকিয়া সরকার ১৬০ জন মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল। প্রায় দু'দিন বাদে ২২ জুলাই সরকার তৎপর হয়। সেদিন শুধু মাত্র ট্রাক ভর্তি করে লাশ সরিয়ে আনা হয় বরপেটা মেডিক্যাল কলেজে। এমনই এক লাশের গাড়িতে বাবা-মা'কে নিয়ে একরকম জোর করেই বাহাবাড়ি ছেড়েছিলেন সদ্য যুবক আবুল কালাম আজাদ। অনেকের মতোই তিনি বা তাঁর পরিবার আর ফিরে যাননি। পিছনে পড়ে রইল তিন পুরুষের গ্রাম এলেঙ্গাবাড়ি, বাস্তুভিটে, খেতের জমি। ত্রাণের ১৪টি টিন আর পাঁচ হাজার টাকা সম্বল করে, কিছুদিন ত্রাণ শিবিরে কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে কালামের পরিবার। কিন্তু ফের নিজ দেশে 'বিদেশি' অপবাদ মুছতে দ্বারস্থ হতে হয়েছে এনআরসি কর্তৃপক্ষের দরবারে। নিজে এ-যাত্রা সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেও বড় দাদা আবদুল হালিম পড়ে গিয়েছেন ৪০ লক্ষের ফাঁদে। নামনি, উজান ও বরাক অসমের প্রায় সর্বত্র এমন অসংখ্য কাহিনি ছড়িয়ে রয়েছে। যে কাহিনি ভারত কখনও মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায়নি। প্রান্তিক রাজ্যের কাহিনি অবহেলার প্রান্তকথাই হয়ে রয়ে গিয়েছে। আজ লক্ষ লক্ষ মানুষের 'জাতি মাটি ভেত্তি' এক আইনি এবং আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভেসে যেতে বসেছে। আশার কথা এটুকুই যে, অবশেষে দেশ জুড়ে এ বিষয়টি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে আলোচিত হচ্ছে।

এনআরসি

এনআরসি বা ন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন অব সিটিজেন যা বাংলা করলে দাঁড়ায় জাতীয় নাগরিকপঞ্জি। আমরা এখানে বহুল ব্যবহৃত এনআরসি যেমন বলব তেমনি সংক্ষেপে নাগরিকপঞ্জি বা পঞ্জি বলব। ১৯৫১ সালে জনগণনার পাশাপাশি এই নাগরিকপঞ্জি তৈরি হয়। আর এই নাগরিকপঞ্জি নবীকরণের অর্থ হচ্ছে, আপনি যে দেশের নাগরিক তা প্রমাণ করার জন্য ১৫ ধরনের প্রামাণ্য তথ্য দিতে হবে। যদিও, এর মধ্যে অত্যন্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি নথি গ্রহণযোগ্য হবে না বলে এই কর্মকাণ্ডের প্রধান সুপ্রিম কোর্ট নিয়োজিত সিইও প্রতীক হাজেলা সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন এবং তার মান্যতা দেওয়ার জন্য শীর্ষ আদালতের কাছে আবেদন জানান। যা নিয়ে প্রবল বিতর্ক বাঁধে। চূড়ান্ত খসড়া তালিকা প্রকাশের পর এমন একটি পদক্ষেপ কাউকে খুশি করেনি। অসমের বিজেপি-অগপ সরকারও যার বিরোধিতায় সরব হয়।

এনআরসি'র ক্ষেত্রে পঞ্জিভূত হতে গেলে যা করণীয় তা হল, আপনাকে বংশানুক্রমিক তথ্য দিয়ে প্রমাণ করতে হবে আপনার পূর্বপুরুষ এ দেশের নাগরিক ছিলেন, ১৯৫১ সালের নাগরিকপঞ্জিতে থাকা পূর্বসূরির সঙ্গে যুক্ততা তৈরি করতে হবে। যাকে লিগ্যাসি ডেটা বলা হচ্ছে। পিতা-মাতার স্থায়ী বাসস্থানের নথি, জন্মের নথি, বিবাহের নথি, ভোটার তালিকা, সরকারি চাকরি কিংবা পেশাদারি কাজে যুক্ত থাকার নথি এবং অন্যান্য তথ্যের সাহায্যে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে আপনি ১৯৭১ সালের আগে এ-দেশের নাগরিক বা আপনার রক্তসম্পর্কের আত্মীয়রা নাগরিক ছিলেন। অবশ্য ১৯৫১ সালের পঞ্জি আদৌ প্রামাণ্য তথ্য হওয়ার যোগ্য কি না সে নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। ২০১৮'র ৭ অগস্ট সমাজতত্ত্ববিদ এবং দ্য বিলিগার্ড নেশন: মেকিং এন্ড আনমেকিং অব দি আসামিজ ন্যাশানালিটি গ্রন্থের লেখক সজল নাগ আনন্দবাজার পত্রিকায় এক উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধে সরাসরি এই প্রশ্ন তুলেছেন, "১৯৫১ সালের জাতীয় নাগরিকপঞ্জি তৈরি হয়েছিল খুব গোপনে, জনশুমারির জন্য জমা দেওয়া স্লিপের ভিত্তিতে। সেই প্রক্রিয়ায় নজরদারির সুযোগ ছিল না, এই পঞ্জি প্রামাণ্য তথ্য হিসেবে গণ্য হওয়ারও যোগ্য ছিল না। আক্ষেপের কথা, নাগরিকত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি কোনও প্রামাণ্য তথ্য হতে পারে না – এই মর্মে কোনও প্রতিবাদী আবেদন সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়েনি।"

হঠাৎ কেন অসম রাজ্য জুড়ে সেখানে বসবাসকারীদের উপর ভারতের নাগরিক হিসেবে প্রমাণ দেওয়ার দায় চাপিয়ে দেওয়া হল? এর উত্তর লুকিয়ে রয়েছে অসম আন্দোলন এবং ১৯৮৫ সালের অসম চুক্তির মধ্যে। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ আসু বা 'অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন' এবং রাজনৈতিক দল 'অসম গণ পরিষদ'-এর 'বিদেশি তাড়াও' আন্দোলনের কথা আমরা জানি। এই আন্দোলনের পিছনেও আরও এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। সে কথায় পরে আসব। অর্থাৎ, বলতে চাইছি, অসম আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তা ছিল সুপ্ত। সে বারুদের স্তূপে স্ফুলিঙ্গ হিসেবে কাজ করল মঙ্গলদৈ লোকসভার উপনির্বাচন। ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে এই কেন্দ্রে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হয়। এই সময় নির্বাচনী অফিসে একের পর এক অভিযোগ এই মর্মে জমা পড়তে থাকল যে, বহু বাংলাদেশি ভোটার তালিকায় রয়েছে। এমন প্রায় ৭০ হাজার অভিযোগ জমা হয়। সরকার অভিযোগ পত্র খতিয়ে দেখতে ট্রাইব্যুনাল তৈরি করে। ট্রাইব্যুনাল ৪৫ হাজার অভিযোগ অনুমোদন করে। যা হল মোট ৬ লক্ষ ভোটারের ৬৪ শতাংশ। অভিযোগের এমন ধারাবর্ষার পিছনে অত্যন্ত সংগঠিত শক্তি কাজ করছিল বলেই মনে হয়। এ কথা মনে করার কারণ আছে এই জন্য যে, ১৯৭৮ সালে দিল্লিতে তৎকালীন চিফ ইলেকশন কমিশনার শ্যামলাল শাকধের মন্তব্য করেন, "In one state (Assam), the population in 1971 recorded an increase as high as 34.98 per cent over the 1961 figures and this increase was attributed to the influx of a very large number of persons from the neighbouring countries."

অর্থাৎ, ১৯৭৯ সালের অভিবাসী বিরোধী ঝোঁক বলুন, প্রবণতা বা পক্ষপাত বলুন তার সূত্রটি বাঁধা হয়ে গেল। এই সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে তা মান্যতাও পেল। একটি কথা মনে রাখতে হবে এই সময় কী কেন্দ্রে কী রাজ্যে কংগ্রেস হীনবল। বিমলা প্রসাদ চালিহা বা ফকরুদ্দিন আলি আহমেদের মতো নেতারা প্রয়াত। দেবকান্ত বরুয়ার মতো নেতাও জরুরি অবস্থা ও জনতা পার্টির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে অস্তাচলে। যদিও ১৯৭৯ সালের মধ্যে জনতা পার্টি ত্রিধা বিভক্ত হয়। ২২ অগস্ট ১৯৭৯ চরণ সিং সরকারের পতনের ফলে লোকসভার মেয়াদ শেষ হয়। ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ অসমের গোলাপ বরবরা মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। ১৪ জানুয়ারি ১৯৮০ ইন্দিরা গান্ধী ফের ক্ষমতায় আসীন হলেন।

মঙ্গলদৈ-এ ফিরি। লোকসভা আসনটিতে ভোটার তালিকা সংশোধন করতে গিয়ে এই যে বাড়তি ভোটারের সন্ধান পাওয়া গেল। অভিযোগ উঠল, যার এক বড় অংশ বাঙালি মুসলমান। এরা কি বিদেশি বা কতজন বিদেশি – এই খোঁজের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়াল, আশু ইস্যু হয়ে দাঁড়াল বিদেশি ও অনুপ্রবেশ সমস্যা। প্রফুল্লকুমার মহন্ত, ভৃগু ফুকনের নেতৃত্বাধীন আসু শুধু মঙ্গলদৈ নয়, অসম থেকে বিদেশি বিতাড়নের জোরালো আওয়াজ ওঠাল। 'সেভ আসাম টু সেভ ইন্ডিয়া' হয়ে উঠল প্রধান স্লোগান। পাশে দাঁড়াল 'অসম সাহিত্য সভা'র মতো বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত অসমিয়াদের মধ্যে সাহিত্য সভার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব অসীম। এছাড়াও যুক্ত হল 'পূর্বাঞ্চলীয় লোক পরিষদ', 'অসম জাতীয় দল'-এর মতো সংগঠন। এই আন্দোলনের এক মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি মুসলমান এবং হিন্দু নেপালিরা। কিন্তু, বাঙালি হিন্দু থেকে বিহারি হিন্দুরাও ক্রমে লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে। বিদেশি বলতে কাদের বোঝায় তা এই বাক্য থেকে স্পষ্ট, 'আলি কুলি বাঙালি, নাক চ্যাপ্টা নেপালি'। এঁরা হলেন টার্গেট। আলি বলতে মুসলমান, কুলি অর্থে বিহারি বা হিন্দিভাষী, বাঙালি হল হিন্দু বাঙালি। আন্দোলন যখন ভয়াবহ আকার নেয় তখন দলবদ্ধ মিছিল থেকে আওয়াজ উঠেছে – 'আহ ও আহ/উলাই আ/খেদ অহ খেদ/বিদেখিক খেদ।' এ ছিল ওয়ার ক্রাই। যার বাংলা করলে দাঁড়াবে, 'আয় আয়/বেরিয়ে আয়/খেদাও, খেদাও/বিদেশিদের খেদাও।' আর প্রিয় জয়ধ্বনি ছিল 'জয় আই অসম'। 'আই' অর্থ 'মা'। ছাত্রদের এই আন্দোলনের প্রথম পর্বে পাশে দাঁড়িয়েছিল অসমিয়া জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশ।

১৯৮৫ সালে কেন্দ্রের রাজীব গান্ধী সরকার এবং আসুর মধ্যে অসম চুক্তি সম্পন্ন হ সে চুক্তিতে অবশ্য এনআরসি'র কোনও উল্লেখ

নেই। কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখতে হবে, আন্দোলনের প্রথম পর্বেই আসু ১৯৫১ সালের জাতীয় নাগরিকপঞ্জির ভিত্তিতে ভোটার তালিকা সংশোধনের দাবি তুলেছিল। মোদ্দা লক্ষ্যটি বোঝা যাবে তিনটি শব্দ দিয়ে থ্রি ডি'স – ডিটেকশন, ডিলিশন, ডিপোর্টেশন। এই মুহূর্তে অসমের জাতীয়তাবাদী সংগঠন এবং ভারতীয় জনতা পার্টি কিন্তু বার বার এই লক্ষ্যের কথাই জোরের সঙ্গে বলে চলেছে। নাগরিকপঞ্জি নবীকরণের দাবি কিন্তু বিজেপি'র অসম নির্বাচনের ম্যানিফেস্টোতেই পাওয়া যাবে। এখন কথা হল, তা কি আদৌ সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজব।

অসম চুক্তির মূল দুটি ধারা যা এখানে জরুরি, সে প্রসঙ্গে আসার আগে আর একটি কথা বলে নিই। আসলে তা হল একটি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা। সাংবাদিক, অসম ও উত্তর-পূর্ব বিশেষজ্ঞ এবং বর্তমানে কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ-এর ডিরেক্টর সঞ্জয় হাজরিকার বিখ্যাত গ্রন্থ 'স্ট্রেঞ্জার অব দি মিস্ট/টেলস অব ওয়ার এন্ড পিস ফ্রম ইন্ডিয়া'স নর্থইস্ট'। গ্রন্থে তিনি জানাচ্ছেন, অসম আন্দোলনের সময় বিদেশি বা আসু'র চোখে বাংলাদেশির যে সংখ্যা আসু তুলে ধরেছিল তা হল 'ফোর মিলিয়ন বা ৪০ লক্ষ'। ২০১৮ সালে এনআরসি সেই সংখ্যাটাই কি অবশেষে খুঁজে পেল? না কি তাকে খুঁজে পেতেই হল?

অসম চুক্তির মূল সূত্র দুটি হল, ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে যাঁরা অসমে এসেছেন তাঁরা টানা দশ বছর ভারতে বসবাস করার পরই নাগরিকত্ব পাবেন। এবং ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের পর যাঁরা এসেছেন তাঁদের চিহ্নিত করে বিতাড়িত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার আসু'র কিন্তু মূল দাবি ছিল ১৯৫১ সালের পর থেকে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের সকলকেই বিতাড়িত করতে হবে। পরবর্তীকালে '৫১ থেকে '৬৬ সালে নেমে আসে আসু। কেন্দ্র এই প্রস্তাবেও রাজি হয়নি। তার একটি প্রধান কারণ, সাতচল্লিশ পরবর্তী কালে এই ষাটের দশকে বিপুল পরিমাণ হিন্দু ভারতে চলে আসতে বাধ্য হন। সরকারি হিসেব বাংলাদেশের তৎকালীন শাসকদের মদতে সংখ্যালঘু বিরোধী দাঙ্গার প্রভাবে ১০ লক্ষ মানুষ পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। যার মধ্যে ছিল ৯ লক্ষ ২০ হাজার হিন্দু। ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পাক সেনাবাহিনী নৃশংস হত্যাকাণ্ড শুরু করে। অবশেষে মুক্তিযুদ্ধের শুরু। ওই একাত্তরেই ১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করে।

১৯৮৫ সালে 'অসম গণ পরিষদ' ক্ষমতায় আসে। মুখ্যমন্ত্রী হন প্রফুল্ল মহন্ত। তার আগেই আসু'র দাবি মতো হিতেশ্বর শইকিয়া মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, আসু নেতৃত্ব বা অগপ ১৯৭১-এর ভোটার তালিকা মোতাবেক ১৯৮৪ সালে যে ভোটার তালিকা তৈরি হয়েছিল সেই তালিকাকে মান্য করেই নির্বাচনী যুদ্ধে নেমেছিল। অর্থাৎ নিজেদের মূল দাবি থেকে সরে ক্ষমতা দখলের জন্য আপোস করে নিয়েছিল। যে ভোটারদের পত্রপাঠ ঘাড়ধাক্কা দেওয়ার দাবি তোলা হয়েছিল, তা শিকেয় তোলা হল। আর আগেই বলেছি, ১৯৭১-এর আগে ভারতে আসা মানুষদের বিষয়টি আসু চুক্তিতেই মেনে নেয়।

আর এখানেই আমরা নেলি গণহত্যার প্রসঙ্গ উত্থাপন করব। আসু'র আন্দোলন তখন তুঙ্গে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রশাসন নেই বললেই চলে। ডিগবয় অবরুদ্ধ হচ্ছে বার বার। সামরিক বাহিনীকে ডাকতে হচ্ছে। এই সময় ইন্দিরা গান্ধী ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেও দু'পক্ষই স্ব স্ব দাবিতে নাছোড়। ইন্দিরা ঠিক করলেন বিধানসভা নির্বাচন করবেন। আসু পরিষ্কার জানিয়ে দিল, 'নো ডিটেকশন, নো রিভিশন, নো ইলেকশন'। ভোট বন্ধ করতে বুথে বুথে গণ প্রতিরোধ, জনতা কার্ফু জারি হল। সেতু পুড়ল, গ্রাম আক্রান্ত হল, রাস্তা কাটা পড়ল, বহু ভোট কর্মী ভোট পরিচালনা করতে চাইলেন না। তবু ভোট হল। এক কথায় ভোটের নামে প্রহসন হল। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে, ভোট যতটুকু হল তা বাঙালি প্রধান বরাক উপত্যকা, জনজাতি ও মুসলমান প্রধান কেন্দ্রগুলিতে। ভোটের পক্ষে ছিল নেলি। অর্থাৎ বোঝা যায়, আসু আন্দোলনে ভীত, সন্ত্রস্তরা নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের মনোভাব প্রকাশ করে।

তিরাশির ১৮ ফেব্রুয়ারি, ভোট পরবর্তী এক সকাল। নেলি ও তার আশেপাশের ১৪টি গ্রাম তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়। এক একটি দিকে প্রায় দু'হাজার সশস্ত্র জনতা। আগ্নেয়াস্ত্র ছিল তবে বেশি করে ছিল বড়ো বড়ো দা, চওড়া ভারী ছুরি, বর্শা, তির-ধনুক। ছ'ঘণ্টার অপারেশন। সরকারি হিসেব মতো মৃত্যু হয়েছিল প্রায় ২২০০ মানুষের। সিংহভাগ নারী, কিশোরী, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। যাঁরা দৌড়ে নিরাপদ স্থানে পালাতে পারেনি। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ঘরবাড়ি, ফসল। আহত অসংখ্য। নিশ্চিন্তে গণহত্যা চালিয়ে প্রায় হাজার ছয়েক হত্যাকারী ফিরে যাওয়ার ঢের পরে এসেছিল পুলিশ, নিরাপত্তা বাহিনী। অভিযোগ, হত্যাকারীরা মূলত ছিল তিওয়া জনজাতির মানুষ। আসু সমর্থক অসমিয়ারাও ছিল বলেও অভিযোগ। ঘটনার কারণ হিসাবে একটি তত্ত্ব হাজির করা হল যে, এই মুসলমানরা নানা ভাবে তিওয়াদের জমি গ্রাস করে বসতি স্থাপন করেছে। সেই রাগ-ক্ষোভই ১৮ ফেব্রুয়ারি ফেটে পড়ে। যে কথা বলা হল না, নেলির মুসলমানরা ১৯৩০ সাল থেকে সেখানে বসবাস ও চাষাবাদ করছে। সরকারি তথ্য, জমির রেকর্ড তাই বলে। তিওয়াদের জমি যেমন ছিল, সরকারি খাস জমিও ছিল। জমি নিয়ে আদিবাসী-অভিবাসী বিবাদ নতুন নয়। কিন্তু হঠাৎ ৫০ বছর বাদে শত শত তিওয়া এই গণহত্যায় মেতে উঠবে কেন? যদি না কোনো কায়েমি স্বার্থের মদত থাকে। আর শুধু তো নেলি নয়, আরো কয়েকটি গণহত্যার ঘটনা এই সময় ঘটে। দরং জেলার চাউলখোয়া ও খয়রাবাড়িতে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানরা আক্রান্ত হন। শোণিতপুর জেলায় অসমিয়াদের হাতে আক্রান্ত হন বোড়ো জনজাতির মানুষ। বোড়োদের তাড়া করে অরুণাচল সীমান্তে পাঠানো হয়। নেলি থেকে গোহপুর, প্রায় তিন থেকে চার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। ঘরবাড়ি হারিয়ে উদ্বাস্তু হন সাড়ে তিন লাখ। এই গণহত্যাগুলির স্বরূপ উদঘাটিত করার জন্য টি পি তেওয়ারি কমিশন গঠন করেন মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়া। সে রিপোর্ট দিনের আলোর মুখ দেখেনি। নেলি সহ কোনও হত্যাকাণ্ডে একজন দোষীরও শাস্তি হয়নি। নিহতদের পরিবার, আহতরা কিংবা যাঁরা বাসস্থান, ফসল হারিয়েছেন তাঁরা কেউ ক্ষতিপূরণ পাননি। নেলি কিংবা গোহপুর কোনো ছায়া ফেলেনি অসম চুক্তিতে। এখানে এ কথাও উল্লেখ থাক, ১৯৮৩ সালে গুয়াহাটির মালিগাঁও রেল ময়দানে অটলবিহারী বাজপেয়ী এক নির্বাচনী জনসভায় ঘোষণা করেছিলেন, 'খুন কা নদীয়া বহেঙ্গি' যদি সরকার নির্বাচন করে। নেলি

হত্যাকাণ্ডের পর এই অভিযোগও উঠেছিল, এর পিছনে আরএসএস-এর মদত রয়েছে। আবারও মনে করিয়ে দিই, আসু'র দাবি ছিল ভোটার তালিকা সংশোধন করে, বিদেশি বিতাড়ন করে ভোট করতে হবে। ইন্দিরা মানেননি। যাঁরা ভোট দিয়েছিলেন বা যে অঞ্চলে ভোট হয়েছিল, সেখানেই আক্রমণ নামিয়ে আনে আসু। আবার সেই ভোটার তালিকা মান্য করেই অগপ ক্ষমতায় এসেছিল। এবার আসু-আরএসএস 'সখ্যতা'র প্রসঙ্গে আসি।

নির্বাচন পরবর্তী একের পর এক হত্যাকাণ্ডে আসু'র সক্রিয় ভূমিকার কথা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। পাশাপাশি, আরএসএস ও আসু নেতৃত্বের একাংশের ভূমিকাও সংবাদ মাধ্যমের নেকনজরে পড়ে। 'অনলুকার', 'সানডে', 'ইন্ডিয়া টুডে' পত্রিকায় 'আসু ভল্যান্টিয়ার ফোর্স'-এর তৎকালীন সর্বাধিনায়ক জয়নাথ শর্মার সঙ্গে আরএসএস-এর সম্পর্ক নিয়ে অভিযোগ উঠে আসে। ১৯৮৩ সালের ১১-১২ এপ্রিল গুয়াহাটির জে বি কলেজে আসু'র তৎকালীন সহ সভাপতি নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এক সভায় জয়নাথ শর্মা ও আরএসএস-এর ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা হয় এবং সভার তৃতীয় প্রস্তাবটি ছিল জয়নাথ শর্মার বহিষ্কার বিষয়ক। এছাড়াও আসু'র ধর্মীয় সংখ্যালঘু নেতৃত্বের ১১ জন নেতা নির্বাচন পরবর্তী সংখ্যালঘু বিরোধী হত্যাকাণ্ডসহ আন্দোলন বিষয়ে ১৫ দফা প্রস্তাব পেশ করে। (হু ইস রেসপনসিবল ফর নেলি ম্যাসাকার? আঞ্জুমান আরা বেগম ও দিগন্ত শর্মা, টুসার্কেল.নেট।)

২০০৫ সালে কেন্দ্রের মনমোহন সিংহ সরকার এবং রাজ্যের তরুণ গগৈ সরকারের সঙ্গে আসু'র ফের এক ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়। এই আলোচনায় স্থির হয়, ১৯৫১ সালে হওয়া জাতীয় নাগরিকপঞ্জি নবীকরণ করা হবে। বিদেশি চিহ্নিতকরণের নানা প্রক্রিয়া চলতে থাকলেও, এনআরসি প্রক্রিয়া সেভাবে চালু করেনি পূর্ববর্তী সরকারগুলি। বা বলা ভালো নানা আপত্তি, বিশেষ করে আমসু বা অল অসম মুসলিম স্টুডেন্টস ইউনিয়নের আন্দোলনের ফলে অসমের তৎকালীন তরুণ গগৈ সরকার ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করে। ২০১০ সালের ২১ জুলাই, পাইলট প্রজেক্ট চলাকালীন বরপেটা জেলায় পুলিশের গুলিতে চারজন আমসু সদস্যের মৃত্যু হয়। আজ যে ১৫ নথি মান্যতা পেয়েছে তার পিছনে রয়েছে আমসু'র সদস্যদের এই লাগাতার আন্দোলন এবং আত্মবলিদান।

এছাড়াও ধীরে চলার আরও একটি কারণ হল যে, অসম চুক্তি অনুযায়ী, যেখানে বলা হচ্ছে 'অসমিয়া' জনগণকে রাজনৈতিক সাংবিধানিক রক্ষাকবচের মাধ্যমে রাজনৈতিক নিরাপত্তার যথোচিত ব্যবস্থা করার কথা – তাও এক প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে অনঅসমিয়াদের সামনে হাজির হয়েছিল। কেননা, অসম চুক্তি হয়েছে, সবর্ণ অসমিয়া নেতৃত্বাধীন আসু/অগপ এবং কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে। সেই চুক্তিতে কোথাও নেই বাঙালি, মুসলমান, বোড়ো, কার্বি, ডিমাসা, তিয়া, মিসিং, কার্বি কিংবা ঝাড়খণ্ডীরা। যেন তাঁরা অসমের কেউ নন, অংশী নন। ফলত, অসমিয়ার সংজ্ঞা ঠিক কী হবে, তা নিয়ে সেদিন মতের মিল ঘটেনি। অসম চুক্তি হওয়ার পর মূলত বোড়ো/কাছারিদের মুখপত্র 'দি প্লেনস ট্রাইবাল কাউন্সিল অফ আসাম' বা পিটিসিএ অসম চুক্তির অংশ না-হওয়ার জন্য খুবই বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। "Once again it has been proved beyond doubt that the movement leaders are concerned with the security of the Assamese lingustic minority only, and they are neither concerned about nor do they represent the indigenous linguistic and ethnic groups of Assam." বিরূপ বোড়োরা পিটিসিএ'র মাধ্যমে ১৯৭০ সাল থেকেই অসমের মধ্যে স্বশাসিত অঞ্চল 'উদয়াচল'-এর দাবি জানিয়ে এসেছে। পরবর্তীতে এই দাবি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে স্বাধীন 'বোড়োল্যান্ড' রাজ্য পর্যন্ত পৌঁছায়। অবশেষে তারা স্বশাসিত 'বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল'-এ সন্তুষ্ট হয়। যদিও যে, বোড়োল্যান্ডে তারা সংখ্যালঘু! এই বোড়ো জনজাতিকে একটি স্বতন্ত্র জনজাতি হিসেবে মানতে রাজি হননি কংগ্রেস নেতা এবং প্রথম মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং গোপীনাথ বরদলৈও। তিনি মনে করতেন বোড়োরা বৃহৎ অসমিয়া জাতির অংশ। ১৯৪৮ সালে গঠিত উত্তর-পূর্বের জনজাতি নীতি বিষয়ক বিশেষ সাংবিধানিক সাব কমিটির চেয়ারম্যান গোপীনাথ বরদলৈ ও তাঁর কংগ্রেসি সহকর্মীদের মত ছিল প্লেইন ট্রাইবস বা সমতলে বসবাসকারী জনজাতিরা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রধান সম্প্রদায়ের (পড়ুন অসমিয়া) অঙ্গীভূত হয়ে যাবে। সুতরাং, নাগা বা অন্যান্য পাহাড়িয়া জনজাতিদের মতো সমতলের জনজাতিদের বিশেষ অধিকার বা সুবিধা এমনকি ভাষা-সংস্কৃতি-আত্মপরিচয় রক্ষার জন্য আইনি নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই।

এই দ্বন্দ্ব ও এনআরসি, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সন্দেহের পরিবেশ তৈরি করেছিল। অবশেষে, ২০১৪ সালে আসু প্রভাবিত এনজিও 'আসাম পাবলিক ওয়ার্কস' সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়ে বলে অসম চুক্তির প্রধান ধারা – বিদেশি শনাক্তকরণ, আটক এবং ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দেওয়া – বলবৎ করা হোক। বিচারক রোহিন্টন ফলি নরিম্যান ও বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের ডিভিশন বেঞ্চ শনাক্তকরণের জন্য এনআরসি নবীকরণের নির্দেশ দেন। তাঁরা এও জানিয়ে দেন পুরো প্রক্রিয়াটি আদালতের তত্ত্বাবধানে হবে। রাজ্যে বিজেপি-আসু সরকার প্রতিষ্ঠার পরই অতি দ্রুততার সঙ্গে এই কাজ শুরু হয় এবং অবশ্যই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এবং সর্বোচ্চ আদালতের তত্ত্বাবধানে। যদিও, ২০১৫ সাল থেকেই অর্থাৎ কংগ্রেস আমলেই ঢিমেতালে হলেও এই নবীকরণের কাজ শুরু হয়। ৩০ জুলাই ২০১৮, এনআরসি চূড়ান্ত খসড়া তালিকা প্রকাশ করে জানায়, অসমে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ৪০,০৭,৭০৭।

অভিবাসন ও অসমিয়া জাতীয়তাবাদ

১৮২৬ সালে অসমের ছ'শো বছরের অহম রাজত্বের অবসান ঘটে। শুরু হয় ঔপনিবেশিক শাসন। শুরু থেকে ১৮৭৩ পর্যন্ত অসম ছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত। ১৮৭৪ সালে অসম প্রদেশ চিফ কমিশনারের প্রশাসনিক অধীনে আসে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ এবং লর্ড কার্জনের আমলে ঢাকা হয়ে উঠল পূর্ববঙ্গ ও অসমের রাজধানী। যদিও ১৯১১ সালে অসম প্রদেশে ফের চিফ কমিশনার নিযুক্ত করা হয়।

এ কথা তো সত্যি অসমে ব্রিটিশ শাসনের শুরুর দিকে বাঙালি বর্ণহিন্দুরাই ছিল রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রধান যন্ত্রী। অসমিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণি – যারা মূলত সামন্তবাদী ভূস্বামী ও বর্ণহিন্দু – যা আদৌ পছন্দ করেননি। অসমে

গেড়ে বসার এক দশকের মধ্যে ব্রিটিশ প্রভুরা আদালত, সরকারি কার্যালয় আর বিদ্যালয়গুলিতে বাংলা ভাষা প্রবর্তন করেছিল। অসমের শিক্ষা ব্যবস্থাকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। অসমে প্রথম কলেজ স্থাপিত হয়েছিল ১৯০১ সালে। বাঙালি বাবুরা সেই সময় ঠিক কতটা উস্কানি দিয়েছিল তা প্রমাণ করা কঠিন। তবে, দুর্ভাগ্য অসমিয়া জাতির যে, বুদ্ধিজীবীদের বার বার নানা ভাবে প্রমাণ করতে হয়, অসমিয়া ও বাংলা দুটো স্বতন্ত্র ভাষা। সাম্রাজ্যবাদী ভাগ করে শাসন করার নীতিতে বিশ্বাসী ব্রিটিশরাজ সে কথায় কান দেয়নি। উপরন্তু, অসমের চিফ কমিশনার হেনরি হপকিনস জোরালো এবং অপমানকর ভাষায় ঘোষণা করেন, "I can come to no other conclusion that they (Assamese and Bengali) are one and all ...with an admixture of local archaic or otherwise corrupted and debased words."

এই ভাষানীতির বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার শুরু করে অসমিয়া ভাষার প্রথম পত্রিকা 'অরুণোদয়'। মার্কিন ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা এই পত্রিকা চালু করেন। মিশনারি রেভারেন্ড মোফফাত মিলের নেতৃত্বে চলে ধারাবাহিক প্রচার। অসমিয়া ভাষা যে একটি স্বাধীন, স্বতন্ত্র ভাষা তা নানা ভাবে প্রমাণ করতে থাকে 'অরুণোদয়' পাশাপাশি, তৎকালীন অসমের অসমিয়া বৌদ্ধিক নেতৃত্বের তিন মূর্তি আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন, হেমচন্দ্র বরুয়া ও গুণাভিরাম বরুয়ার নিরলস লড়াইয়ের ফলে ১৮৭৩ সালের মধ্যে অসমিয়া ভাষা পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায়। ১৮৭৪ সালে অসম পৃথক প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেল। অসমে বাংলা চাপিয়ে দেওয়ার এই ব্রিটিশ নীতি অসমিয়াদের মনে বাঙালিদের উপর সন্দেহের বীজ বুনে দিয়েছিল। যা একদিন জাতীয়তাবাদীদের হাতে সার-জল পেয়ে মহীরুহ হবে তবে এখানেই শেষ নয়। ১৮৭৪ সালে বাঙালি প্রধান সিলেট অসম প্রদেশের বাঙালি প্রধান কাছাড়ের সঙ্গে এবং বাঙালি প্রধান গোয়ালপাড়াকে নিম্ন অসমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। যুক্তি ছিল রাজস্ব ঘাটতি মেটাতেই এই সংযুক্তিকরণ। এর ফলে বাঙালি জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেল এবং সেখানকার বাঙালিরাও বাংলা মাধ্যম স্কুলের দাবি জানাতে শুরু করে। এ দাবি অযৌক্তিক ছিল না। কিন্তু গোপীনাথ বরদলৈয়ের মতো কংগ্রেস নেতার বেসরকারি মিশ্র বিদ্যালয়ের প্রস্তাব দিলেও তা মানতে চাননি বাঙালি নেতৃত্ব। ফল, বাংলা ও অসমিয়া মাধ্যমের ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯০২ সালে পূর্ববঙ্গ-অসম রেল যোগাযোগ ঘটার পর পর বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের মুসলমান ও নিম্নবর্ণের চাষিরা বেশি বেশি করে আসতে শুরু করেছিলেন অসমে। যা ব্রিটিশদের উৎসাহে শুরু হয়েছিল মোটামুটি ১৮৮৫ সালের পর থেকেই। একদিকে যেমন তাঁরা আসতেন ময়মনসিং, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া থেকে, অন্যদিকে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার থেকেও চাষিরা গিয়েছিলেন অসমে। বিপুল পরিমাণে পড়ে থাকা জমির টানটাই ছিল মস্ত কারণ। চা বাগানের পত্তন, রেললাইন, তেলের খনির কারণে আদিবাসী শ্রমিক, বিহারি, ওড়িয়া শ্রমিক, রেলকর্মী, সরকারি অফিস-কাছারির প্রশাসনিক কর্মী-বাবুদের ভিড় যেমন বাড়তে থাকল, তেমনই প্রয়োজন হল খাদ্যের চাহিদা। তাই শুধু ইংরেজ নয়, প্রাথমিক ভাবে অসমিয়া জমিদার শ্রেণিও চেয়েছিল পূর্ববঙ্গের চাষিদের। তাদের বিপুল জমিদারিতেই শুধু নয়, চর এলাকারও বিপুল জমি পতিত হয়ে পড়েছিল। ১৮৯৭ সালের মার্চ মাসে আসাম এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি বাবু গুঞ্জানন বরুয়া ব্রিটিশ সরকারকে জানাচ্ছেন, অসমে ৭০.১৫ শতাংশ জমি পতিত পড়ে রয়েছে। পূর্ববঙ্গীয় চাষিদের যেন বিশেষ সুবিধায় জমি দেওয়া হয়, যাতে এই পতিত জমিতে দ্রুত সব রকমের অর্থকরী শস্য উৎপাদন করা যায়। তারও ঢের আগে একই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তৎকালীন অসমিয়া বুদ্ধিজীবী আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন। বিশেষ সুযোগ এই চাষিরা পেয়েছিলেন, তার কারণ, ব্রহ্মপুত্রের বানভাসি চরে ধান ফলানোর বিদ্যে জানা ছিল না সেই সময়ের স্থানীয় চাষিদের। জমা জলে যে বীজের চারা চড়চড়িয়ে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, সে বীজও নিশ্চয় সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন চাষিরা। যার খোঁজ জানতেন না তিয়া, রাভাদের মতো জনজাতি কিংবা অসমিয়া হিন্দু চাষিরা। শুধু ধান নয়। অর্থকরী ফসল হিসেবে পাট চাষ ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

বিভেদ-বিদ্বেষ শুরু হল যখন ক্রমে এই চরবাসী কৃষক শ্রেণির এক অংশ চর ছেড়ে মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে শুরু করল। বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বদল ঘটছিল দ্রুত। একদিন যে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি দরিদ্র শ্রমজীবী অভিবাসীদের স্বাগত জানিয়েছিল, ক্রমে তাদের এক অংশের উগ্র জাতীয়তাবাদী রূপটি পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল। বরাক উপত্যকা বাঙালি প্রধান ছিলই, দেখা গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে বরপেটা, ধুবড়ি, গোয়ালপাড়ার মতো জেলাগুলি বাঙালি প্রধান হয়ে উঠেছিল। ১৯৩১ সালের মধ্যে অসমে বাঙলাভাষীর সংখ্যা দাঁড়াল ১০,৮৭,৭৭৬ বা জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ। অসমিয়াভাষীর সংখ্যা ১৯,৮১,৩৬৯ বা ৪২ শতাংশ। অভিবাসী বিরোধী রব উঠল। অভিবাসীরা যাতে নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রিত এলাকার অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের দু'পারের এক কাল্পনিক রেখার বাইরে না যেতে পারে তার জন্য ব্রিটিশ প্রশাসন তৈরি করেছিল 'লাইন সিস্টেম'। নদীর ভাঙনে নতুন এলাকার চাষ জমির সন্ধান জরুরি ছিল। আবার প্রয়োজন ছিল স্থায়ী ঘরদোরের জন্য উঁচু ডাঙা জমি। স্থানীয়দের সঙ্গে এই নিয়েই সংঘাত তীব্র হয়। সীমানা ছাড়ালেই মুসলমান চাষিদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া সহ নানা অত্যাচার বাড়তে থাকে। যে-জমির লড়াই ক্রমে সাম্প্রদায়িক ও জাতিদাঙ্গার রূপ নিয়েছে এবং আজও অব্যাহত। ১৯২৮ সালে লাইন সিস্টেমকে সহায়তা করার জন্য ব্রিটিশ প্রশাসন 'কলোনাইজেশন স্কিম' চালু করে। ১৯৯৯ সালে অসমের এক প্রাক্তন মুখ্যসচিব বীরেন্দ্র সিং জাফা লিখছেন, "failure of both measure was evident as the immigrant settlers from East Bengal were in occupation of 37.7% land by 1936 in Nowgong Distric alone."

১৯২১ থেকে ১৯৩১ এই দশ বছরে নগাঁও জেলায় অভিবাসীদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় তিন লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ। কিন্তু এ কথা বলা যাবে না এই অভিবাসীরা বিদেশি কিংবা অনুপ্রবেশকারী। অন্যদিকে, কোনও কোনও ইংরেজ প্রশাসক এই প্রব্রজনকে খুবই খারাপ চোখে দেখা শুরু করেছিলেন। যেমন, ১৯৩১ সালের সেন্সাস কমিশনার সি এস মুলেন তাঁর রিপোর্টে লিখছেন (ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করবেন), "The immigrant army has almost completed the conquest of Nowgong. The Barpeta sub-division of Kamrup has fallen to their attack and Darang is being invaded. Sibsagar has so far escaped completely but

a few thousand Mymensinghias in North Lakhimpur are at outpost which may, during next decades prove to be vulnerable for major operations." এই সারগর্ভ বাণী যে সাধারণের মনে গভীর ভীতির সঞ্চার করেছিল তা সহজেই অনুমেয়। ৫০ বছর পরেও আসু'র মুখে আমরা এই বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছি।

আগেই আলোচনা হচ্ছিল 'লাইন সিস্টেম'-এর কথা। অর্থাৎ অসমিয়া-অভিবাসী বিভাজনের কথা। ভাষা সেই বিভাজনের আগুনে ঘি ঢালল। যখন ১৯৩৬ সালে পশ্চিম গোয়ালপানার কৃষক নেতা মতিয়ুর রহমান মিয়াঁ অসম বিধানসভায় ঘোষণা করল, "আমরা বাঙালি, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা।... বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি অসমিয়া ভাষা আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়, আমাদের সন্তানদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়, আমরা যদি আমাদের মাতৃভাষা থেকে বঞ্চিত হই, তবে তা আমাদের সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষা থেকে বঞ্চিত করার সমতুল্য হবে।" মতিয়ুর রহমানের এই বক্তব্য আসলে বাঙালি অর্থাৎ শিক্ষিত উচ্চবর্গীয় হিন্দুদের আশা-আকাঙ্ক্ষারও প্রতিধ্বনি। এর আগেই রব উঠতে শুরু করে সিলেট ও অন্যান্য বাঙালি প্রধান অঞ্চল অসম থেকে ছেঁটে ফেলার। ১৯২৭ সালে 'অসম সহিত্য সভা'র বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তরুণ রাম ফুকন বলেছিলেন, "আমরা অসমিয়ারা ভারতীয়দের মধ্যে এক স্বতন্ত্র জাতি। যদিও আমাদের ভাষার ভিত্তি সংস্কৃত, তবু স্বতন্ত্র ভাষা। একটি উদীয়মান জাতি তার জীবনীশক্তি দেখায় অন্যান্যদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। দুর্ভাগ্য, আমাদের ক্ষেত্রে তা অন্যরকম। আমরা শুধু নির্ভরশীল নই, আমাদের প্রতিবেশী (বাঙালি) আমাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে গিলে খেতে চাইছে। অসমিয়া ভাইয়েরা বর্তমান পরিস্থিতিকে বুঝতে গেলে আপনাদের অতীত গৌরবের প্রতিফলনে দেখতে হবে।"

কংগ্রেস নেতা ও সুলেখক অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী মনে করতেন অসমের উপর অসমিয়াদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। তাঁর বক্তব্য ছিল, Assamese to "ensure full control...over Assam's land and natural resources, agriculture, commerce and industry, trade, employment, language and literature, culture and ethos." এই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের লড়াই আজও লড়ছেন জাতীয়তাবাদীরা।

শুধু জাতিগত ভাবে বাঙালির সঙ্গে সংঘর্ষে না নেমে, অসমিয়া বুদ্ধিজীবীরা ভাষার প্রশ্নে শিক্ষায় দীক্ষায় অপেক্ষাকৃত ভাবে পিছিয়ে থাকা বাঙালি মুসলমানদের অন্য পথে মন জয়ের চেষ্টা শুরু করলেন। সে হল সাম্প্রদায়িক পথ। ১৯৩১ সালে অসম সাহিত্য সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী অভিবাসী মুসলমানদের উদ্দেশে বললেন, "ময়মনসিং থেকে আসা অভিবাসীদের আমি বলতে চাই তাঁরা আর বাঙালি নয়, অসমিয়া হয়ে গিয়েছেন। এই প্রদেশের আনন্দ, ব্যথা এবং সমৃদ্ধি ও অধঃপতনের তাঁরা সমান সমান অংশীদার। তাদের স্থানীয় ভাষা শেখা উচিত এবং তাঁরা শিখছেন। বর্তমানে বাংলা ভাষার সঙ্গে তাঁদের ভাষার মিল শূন্য। বড় কথা যে, মূল বাংলা ভাষা থেকে তাঁদের দূরত্ব অনেকখানি। অতএব আমরা তাঁদের স্বাগত জানাচ্ছি। অসমিয়া সংস্কৃতি ও জাতির উন্নয়নে তাঁরা তাঁদের অবদান রাখুন।" সমস্যাটি এখানেই যে, অসমিয়া না হয়েও যে বাঙালি, মুসলমান, জনজাতিরাও অসম প্রদেশের আনন্দ, ব্যথা এবং সমৃদ্ধি ও অধঃপতনের...সমান সমান অংশীদার হতে পারেন এবং হয়েছেনও – এই সার সত্যটি জাতীয়তাবাদীরা বুঝতে চায়নি। আজও চায় না। মূল আলোচনায় ফিরি।

সাতচল্লিশে দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে সিলেটের প্রধান অংশ গণভোটের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকেই বেছে নিয়েছিল। অসমিয়া কংগ্রেস নেতৃত্ব তাই চাইছিলেন। তাঁদের খুশি ধরা পড়ে স্বাধীনতার পর অসম বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে। রাজ্যপাল স্যার আকবর হায়দরি যখন বলেই ফেলেন, "The natives of Assam are now masters of their own house...the Bengalee has no longer in power, even if he had the will, to impose anything on the people of these Hills and Valleys which constitutes Assam. The basis of such feelings against him as exists is fear, but now there is no cause of fear." পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈ ঘোষণা করছেন, "অসম অসমিয়াদের জন্য।" ঘোষণা করছেন তৎকালীন অসমের রাজধানী খাসি পাহাড়ের শিলংয়ে এবং এই বাস্তবতা বিস্মৃত হয়ে যে, ১৯৪৭-এর অসম মানে মণিপুর ও ত্রিপুরা বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ উত্তর-পূর্ব। অর্থাৎ, খাসি,গারো, নাগা, মিজো, অরুণাচলীরা। তাঁরা কেউ অসমিয়া নন। এর ফল ভালো হয়নি। সে কথায় পরে আসছি। অসমের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সুজিৎ চৌধুরী ('বরাক উপত্যকার একষট্টি সালের ভাষা আন্দোলন : স্থানীয় রাজনীতির সদর-অন্দর'।) ১৯৪৮-এর ২৮ মে জারি হওয়া বরদলৈ সরকারের একটি নির্দেশের উল্লেখ করেছেন, "The government desires to draw your (Deputy Commissioner) personal attention with regard to following non-resident population of the district. These people are not qualified to be voters. They may be staying with friends, relations or as refugees or labourers. Great caution will be necessary on part of your staff to see not a single individual of these class creep into the electoral roll by any chance." বুঝতে অসুবিধা হয় না কাদের কথা বলছেন বরদলৈ। আর এই বক্তব্য তো ১৯৫১-র জনগণনা ও নাগরিকপঞ্জি তৈরির মাত্র আড়াই বছর আগের নির্দেশ। সজল নাগের বক্তব্যটি এই নির্দেশের সঙ্গে আর একবার মিলিয়ে পড়ুন।

১৯৫১-র জনগণনায় গোয়ালপাড়া জেলায় দেখা গেল এক চমকপ্রদ ছবি। অসমিয়াভাষীর সংখ্যা ১৮৩১ সালে ছিল ১,৬১,১৭৯ ও ১৯২১ সালের তুলনায় বৃদ্ধি ছিল ১৬.১১ শতাংশ। ১৯৫১ সালের জনগণনায় তা গিয়ে দাঁড়াল ৬,৮৭,০২৭। অর্থাৎ, ১৯৩১ সালের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছিল ৩২৬.২৫ শতাংশ। আর এই সময় বাংলাভাষীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে উল্লেখযোগ্য ভাবে। ১৯৩১ সালে গোয়ালপাড়ার বাংলাভাষীর সংখ্যা ছিল ৪,৭৬,৪৩৩ জন। ১৯৫১ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১,৯৩,৩৭৯ জনে। অর্থাৎ, পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতাংশের পার্থক্য -৫৯.৪১। আর সমগ্র অসমে ১৯৫১ সালে অসমিয়াভাষীর শতাংশের হার গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ৫৬.২৯ শতাংশ। ১৯৩১ সালের তুলনায় যে বৃদ্ধির হারের পার্থক্য ছিল ১৪৪.৫২ শতাংশ। বাংলাভাষীর সংখ্যাও কমেছিল অস্বাভাবিক হারেই। ১৯৩১ সালে যেখানে বাংলাভাষীর শতকরা হার ছিল

২৭.৫৬ শতাংশ, সেখানে ১৯৫১ সালে তা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৯.৬৪ শতাংশে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পেলেও ভাষার প্রশ্নে রুখে দাঁড়িয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমান। যার ফলশ্রুতি ১৯৫২ সালের ২১ফেব্রুয়ারি। ভাষার জন্য জান কবুল করে দিয়েছিলেন ঢাকার ছাত্র-যুব-বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ মানুষ। আর তার এক বছর আগে ১৯৫১ সালের জনগণনায় নিজেদের অসমিয়াভাষী হিসেবে পরিচয় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন সেই সাবেক পূর্ববঙ্গের ময়মনসিং, বগুড়া থেকে আসা বাঙালি মুসলমান। দিতে বাধ্য হয়েছিলেন জানের ভয়ে, জমি-জীবিকা হারানোর ভয়ে। চর-চাপরি মুসলমানের পাশে সেদিন কেউ ছিল না। নিজেদের হাতে গড়া চরের বহু বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় হয় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বা অসমিয়া মাধ্যমে বদলে ফেলা হয়েছিল। দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে মৌলনা ভাসানির মতো কৃষক নেতা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা বাংলা ভাষার জন্যই লড়াই শুরু করেছিলেন। কিন্তু ফেলে রেখে যাওয়া মুসলমানদের পরামর্শ দিয়ে গিয়েছিলেন অসমিয়া ভাষা গ্রহণ করতে। বোধ হয় বুঝে গিয়েছিলেন এই মানুষগুলোর আর বাঙালি হওয়া হবে না, মুসলমান পরিচয়েই বাঁচতে হবে। তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কোনও বাঙালি (পড়ুন হিন্দু বাঙালি) নেই। আর এ কথাও তো ঠিক যে হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার তাদের দেশ ছাড়ার এক অন্যতম বড় কারণ। তার সঙ্গে যদি থাকে বিনি পয়সায় জোড়া বলদ, লাঙল পাওয়ার সুযোগ এবং তিন বছর খাজনাবিহীন জমি পত্তনের অধিকার তবে সে সুযোগ ছাড়ে ক'জনা। ট্রেনে, স্টিমারে যাওয়ার জন্য পাঁচ টাকার 'ফ্যামিলি টিকিট'-এর বন্দোবস্ত ছিল। শুধু বাঙালি পরিচয়টি লোপ পেয়ে গেল।

পাশাপাশি, আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত অসমের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন স্যার সৈয়দ মহ. সাদুল্লা। সাদুল্লা ছিলেন মুসলিম লিগ নেতা। ১৯৪১ সালে তিনি অভিবাসীদের জন্য ল্যান্ড সেটেলমেন্ট নীতি ঘোষণা করেন। যার অর্থ অভিবাসীরা অসমের যে কোন প্রান্তে পাঁচ জনের পরিবারের জন্য ২০ বিঘা জমি পেতে পারে কিন্তু তা কখনোই ৩০ বিঘার বেশি হবে না। চার বছর পর তিনি মহ. আলি জিন্নার প্রধান সহকারী লিয়াকত আলি খানকে লিখছেন, "In the four lower districts of Assam valley (Goalpara, Dhubri, Kamrup, Naogaon), these Bengali immigrant Muslims have quadrupled the Muslim population during last 20 years." প্রধানমন্ত্রী সাদুল্লার স্লোগান ছিল 'গ্রো মোর ফুড'। বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতিতে ইংরেজের বিশ্বাসযোগ্য মিত্র হিসেবেই নাকি এই অধিক খাদ্য উৎপাদনের স্লোগান দেওয়া হয়েছিল। তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল অবশ্য আদৌ খুশি হননি। তিনি 'গ্রো মোর ফুড'-এর নামে সরকারি জমিতে 'গ্রো মোর মুসলিম' নীতি চলছে বলে কটাক্ষ করেন। গোপীনাথ বরদলৈ নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের সঙ্গেও রীতিমতো রাজনৈতিক দ্বৈরথ শুরু হয়। ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব ছিল পূর্ববাংলা বা পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হোক অসম। স্যার সাদুল্লারও ইচ্ছে ছিল তাই। অবশ্য তা হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। আজও অসমে বাঙালি বললে হিন্দু বাঙালি বোঝায়। মুসলমানরা ভাষাহীন, ভূমি পরিচয়হীন, জাতি পরিচয়হীন মুসলমান রয়ে গেল। অসমের জাতি তালিকাতেও তারা মুসলমান।

এর পরও, ১৯৫১-র পরেও নিজ দেশে সংখ্যালঘু হওয়ার অমূলক ভয় কাটল না অসমিয়াদের। অসমিয়াকে রাজ্যের একমাত্র প্রধান ভাষা করার দাবি ক্রমে জোরালো হতে লাগল। ফলশ্রুতি ১৯ মে ১৯৬১। ১৯৬০ সালের ২৩ জুলাই শিলচরে 'নিখিল আসাম বাংলা ভাষা সম্মেলন' দাবি জানায় অসমকে বহু ভাষাভাষী রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করা হোক। তবু অসমিয়াকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ দেখা দেয়। বরাক উপত্যকার কংগ্রেস বিধায়ক রণেন্দ্রমোহন দাস ও মন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরী প্রতিবাদে বিধানসভার কক্ষ ত্যাগ করেন। প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬১ সালের ১৫ এপ্রিল থেকে ১৫ মে হরতাল, পদযাত্রা, অরন্ধন কর্মসূচি পালিত হতে থাকে। ১৯ মে ছিল সর্বাত্মক ধর্মঘট। ধর্মঘটকারী শত শত মানুষ শিলচর স্টেশনে রেললাইন অবরোধ করেন। এই নিরস্ত্র সত্যাগ্রহে নির্বিচারে গুলি চালায় পুলিশ। মৃত্যু হয় ১১ জনের। মাতৃভাষার জন্য তাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন। একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে অসমিয়াকে মেনে নেয়নি বড়ো, খাসি, গারো, নাগা, মিজোরাও। ওই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের মাত্র ১০ মাস আগে ২ জুলাই ১৯৬০, শিলচরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'অল আসাম নন-আসামিজ ল্যাংগুয়েজ কনফারেন্স'। বাঙালিদের সঙ্গে মিশল জনজাতি গোষ্ঠীগুলি। সম্মেলনের প্রস্তাবনায় বলা হল:

"The conference of the Non-Assamese speaking people of Assam strongly opposes the move to impose Assamese as the official language for the state of Assam and that the status quo based on the intrinsically multilingual character of the state must be maintained for the peace and security of the eastern region of India."

ফলশ্রুতি, ভারতের সর্ববৃহৎ রাজ্যে ধরল ভাঙন। ১৯৬৩ থেকে ১৯৮৭ সালের মধ্যে প্রথমে ইউনিয়ন টেরিটরি পরে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পেল নাগাল্যান্ড (১৯৬৩), মিজোরাম (১৯৮৬) ও নেফা হল অরুণাচল প্রদেশ (১৯৮৭)। ১৯৭১ সালে মেঘালয় পৃথক রাজ্য হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করে। এই তো দু'দশক আগে, ১৯৯৬ সালে গুয়াহাটির সার্কিট হাউসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার পূর্ণ সাংমা তো বলেই ফেললেন, "আমরা সবাই অসমিয়া বলতাম, এখনও পারি। কিন্তু আমরা অসমিয়া নই। সুতরাং অসমিয়া ভাষা চাপিয়ে দেওয়া মানব না। এ জন্যই অসম ভেঙে গিয়েছে।" অসমিয়া উগ্র জাতীয়তাবাদীদের জনজাতিরা আজও কী চোখে দেখে তা দ্য শিলং টাইমস-এর (২২ জানুয়ারি, ২০১০) এক প্রধান সম্পাদকীয় স্তম্ভে স্পষ্ট।

"For Meghalaya, January 21st is what Independence Day to the rest of India. It was a day when the hill tribes (Khasis, Garos) were given mandate to carve out their own destiny by way of a separate state called Meghalaya. The tribes collectively fought Assamese chauvinism which was manifested in the imposition of the Assamese language as the lingua franca. The movement, popularly known as Hill State Movement was without rancour or bloodshed."

এখানেই শেষ নয়। ইতিহাসে এমন অনেক সব অসংখ্য ঘটনা বিবৃত। কিন্তু আমাদের সময় হয়েছে বর্তমানে ফেরার। ঘটমান বর্তমান।

ঘটমান বর্তমান

২০১৬ সালে অসমে ক্ষমতায় আসে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। এই জয় এক কথায় ঐতিহাসিক। ১২৬টি আসনের মধ্যে একা বিজেপি পায় ৬০টি আসন। ২০১১ সালে যেখানে বিজেপি মাত্র ৫টি আসন পেয়েছিল। জোট সঙ্গী অগপ পায় ১৪টি এবং অন্য জোট সঙ্গী বোড়ো পিপলস ফ্রন্ট পেয়েছিল ১২টি। টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেসের জোটে মাত্র ২৬টি আসন। ২০১১ সালে কংগ্রেস পেয়েছিল ৭৮টি আসন। শতকরা ভোটের হিসেবে দেখা যাচ্ছে ২০১৬ সালে কংগ্রেস ৩১ শতাংশ ভোট পেয়েছে। যেখানে ২০১১ সালে পেয়েছিল ৩৯.৩৯ শতাংশ ভোট। ২০১৬ সালে বিজেপি পেয়েছে ২৯.৫ শতাংশ ভোট। ২০১১ সালে যেখানে মাত্র ১১.৬৭ শতাংশ ভোট পায় বিজেপি। অসমের অন্যতম প্রধান দল এআইইউডিএফ পেয়েছিল ১৩টি আসন যা ২০১১ সালের তুলনায় পাঁচটি কম। ভোট প্রাপ্তির হার দুটি ক্ষেত্রেই সমান ১৩ শতাংশ। বিজেপি'র এই সাফল্যের শুরু কিন্তু ২০১৪ সালের লোকসভা থেকে। ১৪টি আসনের মধ্যে বিজেপি একাই পায় সাতটি আসন এবং ৩৬.৮৬ শতাংশ ভোট।

কেন এই সাফল্য?

নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ থেকে সমাজতত্ত্ববিদ এমনকি বিজেপি'র প্রবক্তাদের বিশ্লেষণের সুর প্রায় এক।

প্রথমত, নির্বাচনী স্লোগান। 'জাতি মাটি ভেত্তি' বা নেশন ল্যান্ড হার্থ বা জাতি মাটি ও সুখী গৃহকোণ বা গৃহ। একেবারেই স্থানীয় যে সেন্টিমেন্ট, যে সামাজিক-রাজনৈতিক আবহ তাকেই তুলে ধরা। আমরা এতক্ষণ তো এই জমি, জাতি বিরোধ, উচ্ছেদ-দাঙ্গার সমস্যা নিয়েই কথা বললাম। অসমের সর্বস্তরের মানুষ এই সমস্যায় জর্জরিত। এই স্লোগানের উপর ভিত্তি করেই অসমিয়া ছাড়াও বোড়ো, ডিমাসা, মিসিং, কার্বি, তিওয়া, ঝাড়খণ্ডি বাঙালি, খিলঞ্জিয়া মুসলমানদের এককাট্টা করার প্রয়াস।

দ্বিতীয়ত, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরা হল সোনোয়াল/কাছাড়ি জনজাতি গোষ্ঠীর সর্বানন্দ সোনোয়ালের নাম। সোনোয়াল ১৯৯২ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ছিলেন আসু'র সভাপতি। ২০১১ সালে যোগ দেন বিজেপি'তে। ২০১৪ সালে লোকসভায় জিতে হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত স্বাধীন মন্ত্রী। অসমের জাতীয়তাবাদীদের কাছে তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি 'জাতীয় নায়ক'। সুপ্রিম কোর্টে তাঁর করা মামলার জন্যই ১৯৮৫ সালে 'ইললিগ্যাল মাইগ্রেন্টস (ডিটারমিনেশন বাই ট্রাইব্যুনাল) অ্যাক্ট, ১৯৮৩ বা আইএমডিটি অ্যাক্ট' বাতিল হয়। এ বিষয়ে আসব। এবং এই প্রথম জনজাতি গোষ্ঠীর কাউকে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরা হল।

তৃতীয়ত, কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে দলে টানা এবং বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি মনোনীত করা। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে অগপ এবং বিপিএফ-এর সঙ্গে সার্থক জোট। অসম কেন্দ্রিক নির্বাচনী প্রচার, জাতীয় রাজনৈতিক ইস্যুকে মাথা চাড়া দিতে না দেওয়া এবং সে কারণেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অসম নির্বাচনে মুখ্য মুখ হিসেবে তুলে না ধরা। বলা হচ্ছে, নির্বাচনের এই লক্ষ্য এবং রণকৌশল বিজেপি'র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধবের মস্তিষ্কজাত। এর সঙ্গে টেনে আনা হয় 'অহমিয়া স্বাভিমান'-এর প্রতীক মোঘলদের বিরুদ্ধে ১৬৭১ সালে সরাইঘাট যুদ্ধের বিজয়ী অহম রাজের সেনানায়ক লাচিত বরফুকনের নাম। সরাইঘাট এক ঐতিহাসিক যুদ্ধ। যে যুদ্ধে পরাজয়ের পর মোঘল সাম্রাজ্য আর কখনও উত্তর-পূর্ব ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়নি। ২০১৬ সালের নির্বাচনকে 'সরাইঘাটের শেষ যুদ্ধ' বলে একদিকে অসমিয়া অস্মিতা জাগিয়ে তোলা অন্যদিকে প্রবল মুসলমান বিদ্বেষকে খুঁচিয়ে তোলাই আরএসএস রাম মাধবের কূটকৌশল। একটি সম্রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধকে হিন্দু-মুসলমানের লড়াইয়ে নামিয়ে আনা অনুল্লেখ রয়ে গেল এই যুদ্ধে মোঘল বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন রাজা রাম সিং এবং লাচিত বরফুকনের বড় ভরসা হয়ে উঠেছিলেন বহু হজরিকা ওরফে ইসমাইল সিদ্দিকি।

পাশাপাশি, অসম নির্বাচনের ঠিক ছয়মাস আগে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ঘোষণা করে, " 'পাসপোর্ট (এন্ট্রি এনটু ইন্ডিয়া) রুলস, ২০১৫' অনুসারে হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন ও পার্শি ধর্মাবলম্বী মানুষ যদি ধর্মীয় কারণে হেনস্থা বা হয়রান হয়ে ভারতে সে দেশের পাসপোর্ট সহ কিংবা পাসপোর্ট ছাড়াই আসেন তবে তিনি ঢুকতে পারবেন থাকতেও পারবেন। তাঁদের বিতাড়ন করা যাবে না।" এই গেজেট নোটিফিকেশনের পরে সংসদে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল হিসেবে আনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে।

'জাতি মাটি ভেত্তি' কী জাতীয় প্রভাব ফেলেছিল সে প্রসঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক উদয়ন মিশ্র ইপিডবলিউ'তে এক নিবন্ধে মন্তব্য করেন, "This had a strong political appeal amongst the indigenous Assamese and all the ethnic groups. ...it was clearly the preservation of the land and the identity of the indigenous people that found greater resonance during the campaign. That is why the elections were referred to as the battle of Saraighat for the Assamese people and memories of the anti-foreigner agitation of the 1980's were revived." এছাড়াও বোড়োদের পাশাপাশি সমতলের জনজাতি তিওয়া ও রাভা এবং পার্বত্য জনজাতি ডিমাসা ও কার্বি জনজাতিদের সংগঠনগুলিকেও বিজেপি তাদের ছাতার আওতায় নিয়ে আসে। উদয়ন মিশ্র যাকে বলছেন 'মাস্টার মুভ'

বিদেশি বিতাড়ন আইন ও প্রক্রিয়া

বিংশশতাব্দীতে অসমিয়া উচ্চমধ্যবিত্তশ্রেণির উত্থান অসমিয়া জাতীয়তাবাদকে এক নতুন মাত্রা দেয়। এঁরা রাজনৈতিকভাবে যেমন ছিলেন বিচক্ষণ তেমনি ভাষা-সংস্কৃতির প্রশ্নেও যথেষ্ট গর্বিত। উনবিংশ শতাব্দীতে নানা স্তরে বাঙালিদের আধিপত্য, ভাষা, জমির প্রশ্নগুলিকে – প্রায় পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তাঁরা ভুলে যেতে পারেননি। সুতরাং, বিদেশি ভীতির রাজনীতি, নিজ রাজ্যে সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার অমূলক ভয় কোনোদিনই অসমের পিছু ছাড়ল না। বিদেশি শনাক্তকরণ, বিতাড়নের জন্য এত আইন বা সন্দেহজনক বিদেশিদের জন্য ডিটেনশন ক্যাম্প, এ দেশের আর কোথাও নেই। এ প্রসঙ্গে আসার আগে বিদেশি শনাক্তকরণ ও বিতাড়নের এক কিস্যা বলে ধরে

নেওয়া যাক। সঞ্জয় হাজরিকার 'রাইটস অভ প্যাসেজ' গ্রন্থে এই কাহিনি বিধৃত।

কে পি এস গিল তখন নগাঁওয়ের পুলিশ সুপার। '৬০-এর দশক। বেআইনি অনুপ্রবেশ নিয়ে তখন অসম বেশ সরগরম। এই সময় অনুপ্রবেশ সমস্যা সমাধানে 'প্রিভেনশন অভ ইনফিল্ট্রেশন ফ্রম পাকিস্তান বা পিআইপি স্কিম, ১৯৬৪' চালু হয়েছে। গিল চিরকালই ডাকাবুকো অফিসার। কিন্তু তেমন সুবিধা করতে পারছেন না। সেই সময় এক অধস্তন কর্মী পরামর্শ দিলেন, এভাবে হবে না। স্থায়ী বসবাসকারী মুসলমান নেতাদের ডাকুন, তাদের কাছে জানতে চান নতুন কারা কারা এসেছে। কাজ হবে। এরপর জেলার বিভিন্ন থানার পুলিশ অফিসাররা মুসলমান নেতাদের নরমে-গরমে বোঝালেন, তালিকা তৈরি হতে থাকল। এবার তাদের তুলে এনে নগাঁও জুবিলি ময়দানে রাখা হল। পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তগামী ট্রেনে চড়িয়ে দিয়ে পার করা হতে থাকে। গিলের দাবি, এভাবে দু'বছরে তিনি এক লক্ষ পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালিকে সীমান্ত পার করিয়েছেন। আরো এক লক্ষ নাকি অসমের অন্য অঞ্চল থেকেও পার করা হয়েছে। গিল মনে করতেন 'আত্মসমর্পণ' করিয়ে সীমান্ত পার করে দেওয়াটাই সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি। আমরা জানি গিলরা এভাবেই ভাবেন।

পিআইসি, ১৯৬৪ সালের আগে ছিল 'ইমিগ্রান্টস (এক্সপালসন ফ্রম আসাম) অ্যাক্ট, ১৯৫০। এই আইনে ছিল হিন্দু-মুসলমান বৈষম্য। মুসলমান মানে বেআইনি অনুপ্রবেশকারী। আর হিন্দুরা শরণার্থী। বিজেপি তখন থাকলে নিশ্চয় আহ্লাদে আটখানা হত। তবে হিন্দুত্ববাদিতার শিকড় এই দেশে অনেক কালই অনেক গভীরেই চারানো। ১৯৫৭ সালে এই সংবিধান বিরোধী বৈষম্যমূলক আইন বাতিল হয়। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার সুকৌশলে একটি প্রশাসনিক আদেশ জারি করে। সেখানে বলা হয় যদি পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা কোনো হিন্দু ছ'মাস ভারতে বসবাস করেন তবে জেলাশাসকের কাছে আবেদনের ভিত্তিতে তিনি নাগরিকত্ব পাবেন। এই আদেশও পরবর্তীতে বাতিল হয়েছিল। এর পরেও রয়েছে, আইএমডিটি অ্যাক্ট (বেআইনি অভিবাসী নির্ধারণ আইন), ১৯৮৩; সন্দেহজনক অনুপ্রবেশকারীদের উৎখাত বা আটক করার উদ্দেশ্যে 'ডি' বা ডাউটফুল ক্যাটেগরির ভোটার চিহ্নিতকরণ। ১৯৯৭ সালে ইলেকশন কমিশন এই 'ডি' ভোটার শ্রেণিবিভাগ তৈরি করে। নিয়মটা এরকম, ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় কমিশন নিয়োজিত যে ব্যক্তিরা সংশোধন, সংযোজন বা বিয়োজনের দায়িত্বে থাকেন, তাঁদের সন্দেহ হলেই তালিকায় 'ডি' বা ডাউটফুল ভোটারের ট্যাঁড়া পড়ে যাবে। এরপর সেই তালিকা যাবে নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে। আধিকারিক পাঠাবেন সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপারকে (সীমান্ত), তিনি 'ডি' ভোটারকে নোটিশ দিয়ে কেস পাঠাবেন ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে। ১৯৬৪ সাল থেকেই এই ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল কাজ করছে। সীমান্তে পুলিশের যদি আপনাকে বিদেশি বলে সন্দেহ হয় তবে সে একই ভাবে পুলিশ সুপারের জ্ঞাতার্থে এনে ট্রাইব্যুনালে পাঠাবে। ট্রাইব্যুনাল আপনাকে ডেকে পাঠাবে। প্রায় শ'খানেক এমন ট্রাইব্যুনাল রয়েছে অসমে। একটি সাম্প্রদায়িক রিপোর্টে দেখছি ১.২৫ লক্ষ ভোটার 'ডি' তালিকাভুক্ত। আপনি যথাযথ ভাবে নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণ না করতে পারলে আপনার জন্য রয়েছে 'ডিটেনশন ক্যাম্প'। এমন ছ'টি ক্যাম্প (আসলে জেলার জেলগুলিরই একাংশে ক্যাম্প করা হয়েছে) রয়েছে অসমে। সেখানে অত্যন্ত অমানবিক পরিবেশে রয়েছেন হাজার খানেক অত্যন্ত অসহায় গরিব মানুষ। যাঁরা আইনি লড়াই করার ক্ষমতাই রাখেন না। একমাত্র আপিল আদালতটি গুয়াহাটি হাইকোর্টে। বিচারক একজন।

সংসদে আইন পাশ করে আইএমডিটি অ্যাক্ট, ১৯৮৩ চালু হয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধী সরকারের আমলে। এই আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন সর্বানন্দ সোনোয়াল। তাঁর দাবি ছিল, এই আইন আদৌ কার্যকরী নয় এবং এই আইনের ফলে বিদেশি চিহ্নিতকরণ, বহিষ্কার কিংবা ভোটারতালিকা থেকে বাদ দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ছে। তাঁর আরও একটি যুক্তি ছিল, ফরেনার্স অ্যাক্ট, ১৯৪৬ সারা দেশে বলবৎ হলেও অসমে তা বলবৎ নয়। সুতরাং আইনের চোখে তা বৈষম্যসূচক। পাশাপাশি, অটলবিহারী বাজপেয়ী নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ডিরেক্টর যতীন্দ্রবীর সিং আদালতে জানায়, "...since the enforcement of the IMDT Act only 1,494 illegal migrants had been deported from Assam upto 30th June 2001. In contrast 4,89,046 number of Bangladeshi nationals had been actually deported under the Foreigners Act, 1946 from the state of West Bengal between 1983 and November 1988. The IMDT Act failed to fulfill the objective for which it was enacted which is apparent from the poor result and it places Assam in a different position from rest of the country where the Foreigners Act, 1946 is applicable."

এখানে একটি তথ্য দেওয়া জরুরি যে, বিদেশি আইন, ১৯৪৬ অনুযায়ী আপনি বিদেশি বলে অভিযুক্ত হলে আপনাকেই প্রমাণ দিতে হবে আপনি বিদেশি নন। যা ন্যায়ধর্ম নির্ভর বিচার ব্যবস্থা বা ন্যাচারাল জাস্টিসের বিরোধী। এছাড়াও অন্যদিকে আইএমডিটি আইন অনুযায়ী প্রমাণের দায় ছিল অভিযোগকারীর। এছাড়াও আইএমডিটি'তে বিচার ব্যবস্থাই শেষ কথা বলে অথচ ফরেনার্স অ্যাক্ট-এ জোর পুলিশি ব্যবস্থার। এখন তো 'ডাইনি' খুঁজতে গিয়ে অসমের সব মানুষকেই নাগরিকপঞ্জির মাধ্যমে প্রমাণ করতে হচ্ছে তারা বিদেশি নয়। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ২০০৫ সালে সুপ্রিম কোর্ট আইএমডিটি অ্যাক্ট সংবিধান পরিপন্থী বলে ঘোষণা করে। এর পাশাপাশি, এই আইনের আওতাধীন যে আইএমডিটি ট্রাইব্যুনাল, আপিল ট্রাইব্যুনাল তৈরি হয়েছিল তাও বাতিল করে দেওয়া হয়। আদালত বলে, পাসপোর্ট (এন্ট্রি ইনটু ইন্ডিয়া) অ্যাক্ট, ১৯২০, ফরেনার্স অ্যাক্ট, ১৯৪৬, পাসপোর্ট অ্যাক্ট, ১৯৬৭ অসমের ক্ষেত্রেও জারি হবে। আর ১৯৮৩'র ট্রাইব্যুনালের মামলাগুলি পাঠিয়ে দিতে হবে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে। এই রায়ের পর সোনোয়াল অসমিয়াদের কাছে 'জাতীয় নায়ক'-এর মর্যাদা পান।

এত আইন আর আইনের মারপ্যাঁচের ফল হল, পর্বতের মূষিক প্রসব। ১৯৮৫ থেকে ২০০৫, যে সময়ে আইএমডিটি অ্যাক্ট, ১৯৮৩ চালু ছিল এবং যে সময়ে অগপ দু'দুটি দফায় (১৯৮৫-১৯৯০ এবং ১৯৯৬-২০০১) ক্ষমতায় ছিল, সেই সময় প্রায় কুড়ি বছরে মাত্র ৪২ হাজার অভিযোগ জমা পড়ে এবং ২৮ হাজার বিদেশি বলে শনাক্ত হয়। ফেরত

পাঠানো হয় মাত্র ৬৭৪ জনকে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরবর্তী ছ'বছরে ৬৫ হাজার অভিযোগ জমা পড়ে এবং প্রায় ১৩ হাজার মানুষ বিদেশি বলে শনাক্ত হন যদিও মাত্র ২২১ জনকে ফেরত পাঠানো গিয়েছে। এই হল মোদ্দা হিসেব।

আবারও এনআরসি

হরেক কিসিমের আইন আদালত, নানা প্যাঁচ পয়জারের রাজনীতি, দাঙ্গাহাঙ্গামা, গণহত্যা যা পারেনি, তাই করে দেখাল জাতীয় নাগরিকপঞ্জির নবীকরণ। এক কথায় অসমিয়া জাতীয়তাবাদের দাবিতে সিলমোহর বসিয়ে দিল যেন। আসু'র দাবি ছিল ৪০ লক্ষ মানুষ বিদেশি। পঞ্জির খসড়া তালিকাও যেন সুরে সুর মিলিয়ে বলছে, ৪০ লক্ষই বটে, এমনটা মনে হতেই পারে। এই গভীর বিপন্নতা নিয়ে কথা বলার আগে একটি খুবই কম আলোচিত বিষয়ে চোখ বুলিয়ে নেব।

অসম নির্বাচন শেষ হওয়ার পর পর কিন্তু বিদেশি শনাক্তকরণ কিংবা বিতাড়নের কোনও উচ্চনাদ ঢক্কানিনাদ শোনা যায়নি। আইন মোতাবেক উপায়ে দুটি পথ নেওয়া শুরু হয়। প্রথমটি হল, আইনজীবী উপমন্যু হাজরিকাকে অসম বিষয়ক একটি কমিশনের কমিশনার নিযুক্ত করে জাস্টিস রঞ্জন গগৈ ও জাস্টিস রোহিন্টন নরিম্যানের ডিভিশন বেঞ্চ। সুপ্রিম কোর্টের যে বেঞ্চ পরবর্তীতে এনআরসি সংক্রান্ত রায় দেবে। উপমন্যু কমিশনকে বলা হল, তদন্ত করে জানানো হোক অসমের সীমান্তে বেড়া, রাত পাহারা, ফ্লাড লাইট ইত্যাদি যে বন্দোবস্তের আদেশ দিয়েছিল আদালত তার কী হল। কে এই উপমন্যু হাজরিকা? বিজেপি'র ছাত্র নেতা থেকে যাঁর উত্থান এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অরুণ জেটলির হাতে গড়া এক দুঁদে আইনজীবী। অসমে তেমন কোনো ভিত্তি না থাকলেও তিনি গড়ে তোলেন 'প্রব্রজন বিরোধী মঞ্চ'। ২০১২ সালের কোকড়াঝাড়ে বোড়ো-মুসলমান দাঙ্গার পর পর তিনি এই সংগঠন গঠন করেন। ঘোষিত লক্ষ্য, অসমকে বাংলাদেশি অভিবাসী মুক্ত করার জন্য অন্তিম লড়াই। কী হয়েছিল কোকড়াঝাড়ে এক ফাঁকে একটু জেনে নিই। ২০১২ সালে কোকড়াঝাড়ে বোড়ো-মুসলমান সংঘর্ষে ৭১ জনের মৃত্যু হয়েছিল। যার ৯০ শতাংশ মুসলমান। ঘর ছাড়া হয়েছিলেন ৩,৯২,০০০ মানুষ। তাদেরও সিংহভাগই মুসলমান। অভিযোগ উঠেছিল এই দাঙ্গায় অন্যতম প্রধান মদতকারী ছিল বিজেপি।

এই এক সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ১২০ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট জমা দেয়। তার মধ্যে অন্যতম ছিল ১৯৫১ সালের সেন্সাসে যারা নাগরিক তালিকাভুক্ত তারা এবং তাদের উত্তরসূরি ছাড়া আর অন্য কাউকে বিক্রি করার, কেনার বা উপহার দেওয়ার জন্য জমি হস্তান্তর করার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হোক। এখান থেকেই কমিশনের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ ১৯৫১'র পর যারা এ দেশে এসেছেন তারা যেন কেউ নাগরিকত্ব না পান। রিপোর্ট আরো দাবি করে, এই অভিবাসনের ফলে ২০৪৭ সালের মধ্যে অসমিয়ারা সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। সেন্সাস রিপোর্ট দেখলেই এই বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ হয়ে যাবে।

২০০১ সালের জনগণনার তথ্য বলছে, অসমে মোট ২৬.৬ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে অসমিয়া ভাষাভাষীর সংখ্যা ১৩.১ মিলিয়ন। বাংলাভাষীর সংখ্যা ৭.৩ মিলিয়ন। এই দুই বৃহৎ ভাষিকগোষ্ঠী হল অসমের জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ। কিন্তু মোট জনসংখ্যার ৪৮.৮ শতাংশ অসমিয়াভাষী। যেখানে ১৯৯১ সালে অসমিয়াভাষী ছিলেন মোট জনসংখ্যার ৫৭.৮ শতাংশ। অন্যদিকে, বাংলাভাষী জনসংখ্যা এই সময়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১ শতাংশ (১৯৯১) থেকে ২৭ শতাংশে (২০০১)। এর কারণ বোঝার আগে জেনে নেওয়া যাক যে এই ঝোঁক দেখা যাচ্ছে ১৯৭১ সাল থেকেই। ১৯৭১ সালে মোট জনসংখ্যার ৬১ শতাংশ ছিলেন অসমিয়াভাষী। ১৯৯১ সালে দেখা যাচ্ছে জনজাতি রাভা, বোড়ো, মিসিংদের জনসংখ্যা উচ্চহারে বেড়ে গিয়েছে। শতকরা বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ২৪৭ শতাংশ, ১২২ শতাংশ এবং ১১৫ শতাংশ। সমাজতাত্ত্বিক অনিন্দিতা দাশগুপ্তের মতে, এ হল শিলং (১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ অসমের রাজধানী) ও দিসপুরের অসমিয়াকরণের ভ্রান্ত নীতি। পাশাপাশি, জনজাতিদের আত্মপরিচয় এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ও সজাগ হয়ে ওঠার লক্ষণ। বাঙালভাষী জনসংখ্যা বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রেও বলা যায় যে, ১৯৫১ ও পরবর্তীতে চর ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার যে মুসলমানরা অসমিয়া পরিচয়ে পরিচিত হয়েছিলেন, অসম আন্দোলন এবং নেলি সেই 'ন অসমিয়া' বা নব্য অসমিয়া মুসলমানদের মোহভঙ্গের কারণ হয়েছে। তাঁদের একাংশ ফের বাংলাভাষী হিসেবে নিজেদের নিবন্ধিত করেছেন।

একই মত পোষণ করেছেন সঞ্জয় হাজরিকা। তাঁর মতে, "This is happening not because of the migrants but because those who were for long in the tight grip of the larger Assamese fold want out, and want to be comfortable in their smaller ethnic formations: whether it is the Bodos, Tiwas, Karbis, Cacharis or Ravas. Each seeks its own space, territorial, linguistic and political. It appears more to have been the failure of the core Assamese middle class and caste Hindus which have failed to have a respectfull relationships with the 'others' as well as their hold that smaller groups resent."

অন্যদিকে, ২০১১ সালে অসমে জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৩১.১ মিলিয়ন। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল শতকরা ১৬.৯-এ। এই সময় জাতীয় বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১৭.৩। অর্থাৎ, ভারতের তুলনায় অসমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম। মুসলমান জনসংখ্যা ৩০.৯ শতাংশ থেকে বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৩৪.২ শতাংশে। এ বৃদ্ধিও অভিবাসন নয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মুসলমানদের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, সামাজিক পশ্চাদপদতা বেশি। আর এ কারণেই তাদের মধ্যে উচ্চ জন্মহার দেখা যায়।

আর একটি বিষয় উপমন্যু কমিশন দাবি করে বসে যে, ২০০১ সাল পর্যন্ত অসমে বেআইনি অভিবাসীর সংখ্যা ৫০ লক্ষ। আটের দশকের আসু'র তুলনায় তিনি যে এককাঠি সরেস তা নিয়ে নিশ্চয় আর কোনো দ্বিধা থাকতে পারে না। এই রিপোর্ট তুলে ধরে সঞ্জয় হাজরিকা প্রায় চোখ কপালে তুলে লিখছেন, "This is a staggering number for it is one sixth of the population of the state alone and just under one eighth of the entire region. On what basis are such figures trotted out? For that number of people to have come into Assam, they would have had to cross the border every year at not less than 1,00,000 per year for fifty years. Is this humanly

possible especially after Assam's border shranks from over 800 kilo metres with Bangladesh to less than 300 kilo metres by 1971 with the creation of new state of Meghalaya?"

সঞ্জয় এখানেই শেষ করেননি তাঁর বক্তব্য। তিনি আরও হিসেব কষে দেখাচ্ছেন, এই ৩০০ কিলোমিটার সীমান্ত, মানে অসম-বাংলাদেশ মূল সীমান্তের পাঁচ ভাগেরও কম এলাকা, যার আবার ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার নদী, বালিয়াড়ি আর গ্রীষ্ম-বর্ষায় বানভাসি, সে পথ দিয়ে যদি বছরে এক লক্ষ মানুষকে অনুপ্রবেশ করতে হয় তবে তার অর্থ, প্রতি ২৪ ঘণ্টায় অনুপ্রবেশ করতে হবে ২৭০-এর বেশি মানুষকে। উপমন্যু রিপোর্ট নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট কোনও নির্দেশ জারি করেনি। এ বিষয়ে আলোচনাও হয়নি। তবে, এটি যে আসু, অগপ এবং বিজেপি'র একটি হাতিয়ার হয়ে রইল তা বলাই যায়।

অন্য এবং প্রধান আইনি ও প্রশাসনিক হাতিয়ারটি হল নাগরিক পঞ্জি। সর্বানন্দ সোনোয়াল সরকার নাগরিকপঞ্জি নবীকরণে বিশেষভাবে মনোযোগী। এবং যে কোনো বিরোধ সামলাতে নতুন করে আফস্পা জারি করতেও পিছপা হননি। শত মনোযোগের পরেও তালিকা নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই। বাদ পড়ার তালিকায় যে শুধু মুসলমান আছে তা তো নয়। দেখা যাচ্ছে রয়েছেন নেপালি, হিন্দিভাষী, রাজবংশী, এমনকি গারো জনজাতির মানুষরাও। বাঙালি হিন্দুরা তো আছেই। হিন্দুদের সমস্যা সমাধানে বিজেপি নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল আনার গাজর ঝুলিয়ে রেখেছে। যে বিলের উদ্দেশ্য হল এনআরসি'তে যে সমস্ত হিন্দুরা বাদ পড়বে তাদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়া। সঙ্ঘী পরিবারের কাছে পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুরা 'শরণার্থী' এবং মুসলমানরা 'অনুপ্রবেশকারী'। আরএসএস-এর নীতিকেই এই সুযোগে আইনি মর্যাদা দিতে চাইছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। এই নিয়ে অবশ্য আসু, অগপ সহ অসমিয়াদের এক বড় অংশেরই প্রবল আপত্তি রয়েছে। তারা যে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ চায় না, তা এই জন্য নয় যে তা সাম্প্রদায়িক, পক্ষপাতমূলক কিংবা ভারতীয় সংবিধানের ১৪ ধারার পরিপন্থী। যেখানে বলা হচ্ছে, আইনের চোখে সবাই সমান। তারা হিন্দু বাঙালিকেও বিদ্বেষের চোখেই দেখে।

কেন ১৯৫১?

বেশ কিছুকাল আগেই এ প্রশ্ন তুলেছেন এবং তার উত্তরও দিয়েছেন অনিন্দিতা দাশগুপ্ত। ১৯৪১ ও ১৯৫১'র জনশুমারির তথ্যের মধ্যে তুলনা করে তিনি জানান, '৪১-এর তুলনায় '৫১-য় মুসলমান জনসংখ্যা ১৮ শতাংশ কমে গিয়েছিল। এর কারণ ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। যার ফলে বিপুল সংখ্যক অভিবাসী মুসলমান দেশান্তরী হয়েছিলেন। কত তাঁদের সংখ্যা, গবেষক বি পি মিশ্রের গবেষণাকে উদ্ধৃত করে অনিন্দিতা জানাচ্ছেন, গোয়ালপাড়া থেকে ৬০ হাজার, কামরূপ থেকে ২০ হাজার এবং দরং জেলা থেকে ৬ হাজার মানুষ দেশান্তরী হতে বাধ্য হয়েছিলেন। দেখা গিয়েছে, ১৯৫০, ১৯৬০, ১৯৭০ জনশুমারির ঠিক পূর্ববর্তী বছরেই নিম্ন অসমে সংখ্যালঘু নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং মুসলমান বিরোধী দাঙ্গা সংগঠিত করা হয়েছে। পাশাপাশি, সাংসদ হেম বরুয়ার গ্রন্থ 'রেড রিভার এন্ড ব্লু হিলস' থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন অনিন্দিতা। আমরা জানতে পারছি, দেশভাগের সময় অসমের ৫৩ হাজার মুসলমান পরিবার দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। এর একটি বড় অংশ নেহরু-লিয়াকত চুক্তির ফলে ফিরে আসেন বটে কিন্তু ১৯৫১ সালের সেন্সাসে তাঁদের নাম নথিভুক্ত হয়নি। অতএব নাগরিক পঞ্জিতে তাদের নাম নথিভুক্ত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এছাড়াও কম করে দু'লক্ষ হিন্দু বাঙালি এবং গারো উদ্বাস্তু ১৯৫১ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। স্বাভাবিকভাবেই ১৯৫১'র তালিকায় তাঁরাও নেই।

অনিন্দিতা জানাচ্ছেন, "This departure of a significant proportion of the population of lower Assam found categorical mention in the report of 1951, which noted that there was a "clear underestimation of some 68,815 persons". A subsequent census report also stated that "there may have been some Muslims of Goalpara and Kamrup who might not have been able to comeback to their homes in Assam during the 1951 census, (and) some Muslims living in chars and sandbanks of river Brahmaputra also might have been left out of the 1951 census"." অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে, এক ধাক্কায় বেশ কিছু মানুষকে ১৯৫১'র নিরিখেই আইনত বাতিলের খাতায় ফেলে দেওয়া গেল।

অতঃ কিম।

এই লক্ষ লক্ষ বিপন্ন মানুষ কীভাবে রক্ষা পাবেন কোথায় যাবেন তা সত্যিই কি কারও জানা আছে? বাংলাদেশ এই মানুষদের গ্রহণ করবে না। আর এই মুহূর্তে বাংলাদেশের মতো পড়শিকে বিব্রত করতে চাইবে না ভারত। একটি তো জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন। অন্যটি অর্থনৈতিক। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব, ভ্রমণ ও বাণিজ্যিক কারণে বাংলাদেশ গুয়াহাটিতে এবং ভারত সিলেট ও খুলনায় হাই-কমিশনের কার্যালয় স্থাপন করেছে। ২০১৫ সালে দু' দেশ এ বিষয়ে একমত হয়েছিল। এবং এই সময়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ২ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্যিক চুক্তি হয়। ইতিমধ্যেই উত্তর-পূর্ব ভারতে বাণিজ্য পরিবহণ নিয়ে একটি চুক্তির খসড়া অনুমোদন করেছে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা। পাঁচ বছরের এই চুক্তির ফলে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর থেকে আগরতলা-আখাউড়া, ডাউকি-তামাবিল, সুতারকান্দি-শেওলা ও বিবিরবাজার-শ্রীমন্তপুর চেকপোস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশি ট্রাকে ভারতীয় পণ্য পাঠানো হবে। যার সবিশেষ ফল ভোগ করবে বিশেষভাবে অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও পশ্চিমবঙ্গ। এই তো গত ১০ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা-বাংলাদেশ রেল সংযোগ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কথা হল। ছিলেন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এই আগরতলা-চট্টগ্রামের আখাউড়ার মধ্যে প্রস্তাবিত রেলপথ বাস্তবায়িত হলে কেবলমাত্র উত্তর-পূর্ব নয় উপকৃত হবে পশ্চিমবঙ্গও। আগরতলা ও কলকাতার মধ্যে রেল সংযোগের ক্ষেত্রে প্রায় ১০০০ কিলোমিটার দূরত্ব কমবে। নরসিমা রাওয়ের আমলের 'লুক ইস্ট' নীতি, যা বর্তমান জমানায় 'অ্যাক্ট ইস্ট'-এ পরিণত। এই নীতির উদ্যোক্তারা বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার সুযোগ হারাতে চাইবে না।

অন্যদিকে, নাগরিকপঞ্জি বিষয়ে মূলত তিনটি মত উঠে আসছে। এক, অসমিয়া জাতীয়তাবাদ, আসু'র বিদেশি তাড়াও স্লোগানের বকলমে অনঅসমিয়া বিদ্বেষ, বিজেপি'র ফ্যাসিস্ট শাসন ও মুসলমানদের প্রতি ঘৃণার তথ্য তুলে ধরে একটি পক্ষ এনআরসি বাতিলের দাবি তুলছেন। দ্বিতীয় একটি মত, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ ভাবে এনআরসি কর্তৃপক্ষ কাজ করুক। যাতে চিরদিনের জন্য এই বিদেশি খেদাওয়ের রাজনীতি বন্ধ হয়। তৃতীয় পক্ষ, ৪০ লক্ষে খুশি নয়। তাদের লক্ষ্যমাত্রা ৫০ লক্ষ। এর জন্য যে কোনো পদক্ষেপ তারা করবে বলেই মনে করছে প্রথম পক্ষ। তাদের মতে, অত্যন্ত সংগঠিতভাবে খেদাওবাদীরা তালিকা মুক্তদের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাবে। ফলে সংখ্যাটি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

নানা সূত্রেই বার বার এ কথা উঠে এসেছে যে বন্যায়, দাঙ্গায় ভিটেমাটি হারানো হতদরিদ্র মানুষ প্রমাণই করতে পারবেন না যে তাঁরা এদেশের নাগরিক। সংবাদপত্রের বিভিন্ন প্রতিবেদনে বার বার সে তথ্য উঠে আসছে। মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রে পদবীর হেরফের হয়। সাধারণভাবে অবিবাহিতা খাতুন হলে বিয়ের পর তিনিই বিবি কিংবা বেগম ব্যবহার করেন। আবার স্বামীর মৃত্যুর পর হয়ে যান অমুক বেওয়া। এই তফাতও নাগরিকত্ব পাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পূর্ব পুরুষদের পদবী বা নামের বানান ভুল হলেই বিদেশি বলে সাব্যস্ত করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। জন্মের শংসাপত্র নেই এমন মানুষ তো ভুরি ভুরি। আবার তাদের মধ্যে যারা মাধ্যমিক অবধি পৌঁছায়নি, তাদের পক্ষে তো জন্ম তারিখ প্রমাণই করা সম্ভব নয়। আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও গ্রাহ্যে আনা হয়নি পঞ্চায়েতের শংসাপত্র। ভিন রাজ্য থেকে যাঁরা জীবিকার কারণে কিংবা বিবাহ সূত্রে স্থায়ী বসবাস করছেন তাঁদের লিগ্যাসি ডেটা তো স্ব স্ব রাজ্যে। সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে হাজির করতে না পারার জন্য প্রায় কয়েক লক্ষ মানুষের নাম তালিকায় ওঠেনি। তাঁরা পাগলের মতো রাজ্যে রাজ্যে ছুটে বেড়াচ্ছেন। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সংখ্যাটি ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৯৭১।

এতকাল বাদে প্রকাশিত হচ্ছে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের কাজের নানা অসঙ্গতি, কর্মচারীদের একাংশের চরম দুর্নীতি, আইনজীবী ও আইনরক্ষকদের একাংশ কীভাবে গরিব মানুষকে আর্থিকভাবে চুষে ছিবড়ে করে ছেড়েছেন সে কাহিনি। এতকালের যাবতীয় আইনি, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক অপদার্থতার বলি হচ্ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। ইতিমধ্যেই আত্মহত্যার সংখ্যা দুই অঙ্কে পৌঁছেছে। মায়ের নাম বাদ পড়েছে অথচ নতুন করে নথিপত্র নিয়ে হাজিরা দিতে যে অর্থ লাগে তা নেই বলে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে ছেলে। 'ডি' ভোটার বলুন, ডিটেনশন ক্যাম্পে থাকা বন্দিরা বলুন কিংবা পঞ্জিহারা – সিংহভাগই হা-গরিব দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ। শুধু চল্লিশ লক্ষ নয়, প্রকৃত অর্থে সারা দেশকেই এক চরম বিপন্নতার মধ্যে ঠেলে ফেলা হল। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের কোনও চটজলদি সমাধান সূত্র নেই। তবে মনে হয়, জাতীয় নাগরিকপঞ্জি নবীকরণের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং আইনের দ্বারস্থ হওয়া একান্ত জরুরি।

আন্দোলনের কথা

বরপেটা রোড, ২ অক্টোবর ২০১৮। মাত্র বিশ দিনের প্রচেষ্টায় গঠিত 'জনগোষ্ঠীয় যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ' এক 'গণ অভিবর্তন'-এ তিন মাসের মধ্যে ডিটেনশন ক্যাম্প তুলে দেওয়ার ও একই সময়ের মধ্যে ডি-ভোটার সমস্যার সমাধান করার দাবি জানায়। না হলে রাজ্য জুড়ে গণ আন্দোলনেরও ডাক দেয় তারা। বরপেটা রোডের 'সাহিত্য সভা ভবন'-এ আয়োজিত 'নাগরিকত্ব, গণতন্ত্র আর উন্নয়ন' শীর্ষক এই গণ অভিবর্তন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা এনআরসি নবায়ন কর্মকাণ্ড বিষয়ে তাদের যাবতীয় ক্ষোভ উগরে দেয়। জানা গেল, মঞ্চের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, "অসমের গণতন্ত্র ও উন্নয়নের স্বার্থে শুদ্ধ এনআরসি চাই কিন্তু নবায়নের নাগরিকদের উৎপীড়ন করা যাবে না।"

অভিবর্তনের অন্যতম প্রধান দাবিগুলি ছিল এরকম, ক) এখনই ডি-ভোটার সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং সমস্ত ডিটেনশন ক্যাম্প তুলে দিতে হবে। খ) চূড়ান্ত খসড়ায় বাদ পড়া ৪০ লক্ষ আবেদনকারীর ক্ষেত্রে নিয়ম পরিবর্তন করা যাবে না। ১৫টি দলিলই গ্রহণ করতে হবে। গ) মিথ্যা অভিযোগকারীকে শাস্তি দিতে হবে। ঘ) ২০১৪ সালের ভোটার তালিকাকে গ্রহণযোগ্য দলিল হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। কেননা, ১৯৯৫ সালের ভোটার তালিকা ১৯৭১ সালের ভোটার তালিকাকে ভিত্তিবর্ষ হিসেবে তৈরি হয়েছিল। তারই সংশোধিত রূপ ২০১৪ সালের ভোটার তালিকা। ঙ) বিদেশি ন্যায়াধিকরণ বন্ধ করতে হবে। চ) ডি-ভোটার সমস্যা নাগরিকত্ব সেবা কেন্দ্রতেই (এনএসকে) সমাধান করা। ছ) সাম্প্রদায়িকতা তথা উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরোধীতা এবং গণতন্ত্র-উন্নয়ন-নিপীড়িতের অধিকার সাব্যস্ত করণ। এবং অন্যতম গুরুত্ববহ দাবি। জ) অসমের বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া।

কারা এই অভিবর্তনের উদ্যোক্তা?

নিম্ন অসমের বরপেটা, বাক্সা, শালবাড়ি জেলার বিভিন্ন ছাত্র-যুবদের সংগঠন যেমন, কোচ-রাজবংশী ছাত্র সংগঠন 'আক্রাসু', মুসলিম ছাত্র সংগঠন 'আমসু' ও 'এবিএমসু', বাঙালি ছাত্র সংগঠন 'বঙালী যুব ছাত্র ফেডারেশন', ভোজপুরী ছাত্র সংগঠন এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোটেকশন অব ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ রাইট, ফোরাম ফর সোশ্যাল হারমনি এবং 'বসুন্ধরা' – নতুন দিনের বারে'র মতো গণ সংগঠন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কোচ-রাজবংশীদের যোগদান। অসম আন্দোলনের সময় যে 'আলি-কুলি-বাঙালি...' স্লোগান উঠেছিল তার উদ্যোক্তা নিম্ন অসমের কোচ-রাজবংশী জাতিগোষ্ঠী। অসম আন্দোলনের সমর্থক ছিল তারা। কোচ-রাজবংশী বহু যুবক রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে মারা গিয়েছেন। সেই জাতিগোষ্ঠীর বহু মানুষ অন্যায় ভাবে নাগরিকপঞ্জি থেকে বাদ পড়েছেন। তার এক অন্যতম কারণ তাদের রায়, বর্মন ইত্যাদি পদবি। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ তারা। অসমে কোচ-রাজবংশীদের জনসংখ্যা প্রায় ৭০ লক্ষ।

এই অভিবর্তনে বক্তব্য রাখেন দেবব্রত শর্মা, গৌহাটি কমার্স কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল এবং গৌহাটি হাইকোর্টের বর্তমান আইনজীবী ড. ঘনশ্যাম নাথ, প্রবীণ সমাজকর্মী হর কুমার গোস্বামীর মতো অসমিয়া বিদ্বজ্জনরা। অধ্যাপক শর্মা মনেই করেন, বর্তমানে "গোটা পরিস্থিতি দুই সম্প্রদায়ের বিভাজন এবং এক সাম্প্রতিক ফ্যাসিস্ট সরকারের শাসনাধীনে

প্রায় নিয়মিত বিভিন্ন জেলা থেকে বিক্ষোভ, সভার খবর পাওয়া যাচ্ছে। যে বিষয়টি নিয়ে এই মুহূর্তে বিভিন্ন সংগঠন সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ শুরু করেছে তা হল বিভিন্ন ডিটেনশন ক্যাম্পে একের পর এক 'অস্বাভাবিক' মৃত্যুর ঘটনা। ডিটেনশন ক্যাম্পে এ পর্যন্ত প্রায় ১০ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও নবায়নের অভিঘাতে আত্মহত্যা কিংবা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা বেসরকারি মতে ৩৫ ছুঁয়েছে। এই মৃত্যুর সুবিচারের দাবিতে 'জনগোষ্ঠীয় যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ' ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়, তেমনি বরাক উপত্যকাতেও একই দাবি নিয়ে গণ সংগঠনগুলি আন্দোলনের ডাক দেয়। নাগরিকত্ব বিল দ্বন্দ্ব এবং পাঁচ বাঙালি হত্যা অক্টোবর-নভেম্বর মাসে যখন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এনআরসি নিয়ে বিক্ষোভ ধূমায়িত, তখনই বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেবের নেতৃত্বে বিজেপি প্রভাবিত এবং হিন্দুত্ববাদী বাঙালি সংগঠনগুলি নাগরিকত্ব বিলের সপক্ষে জোরদার আন্দোলনের ডাক দেয়। পাল্টা হুমকি আসে বিল বিরোধী অগপ এবং কৃষক নেতা অখিল গগৈদের কাছ থেকে। রীতিমতো এক সংঘর্ষের পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে হিন্দুত্ববাদী বাঙালি নেতৃত্ব পিছু হটে। দল এবং সরকারও বিধায়কের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। তার অন্যতম কারণ এনআরসি তাদের কাছে প্রাথমিক লক্ষ্য। যে কাজটি প্রশাসন, আমলা দিয়ে লক্ষ্যমাত্রা ছুঁয়ে ফেলেছে তাকে ঘেঁটে দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আবার পঞ্চায়েত এবং আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের কথাও তাদের মাথায় রাখতে হয়েছে। এর মধ্যে গুয়াহাটিতে আলফার বোমা হামলায় কয়েকজন আহত হন। উত্তেজনা এবং জাতি ঘৃণা ছড়ানোর অভিযোগে দুই আলোচনাপন্থী আলফা নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। একই অভিযোগ শিলাদিত্য দেবের বিরুদ্ধে থাকলেও তিনি ছাড় পেয়ে যান। এই টানাপোড়নের মধ্যে হঠাৎই এক রাতে তিনসুকিয়ায় শ্রমজীবী অতি সাধারণ পাঁচ বাঙালিকে হত্যা করে একদল দুর্বৃত্ত। জড়িয়ে যায় আলফার নাম। গ্রেফতার করা হয় আলফার এক লিংকম্যানকে। আলফা এই হত্যাকাণ্ডের দায় নিতে অস্বীকার করে। আজও এই হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত মীমাংসা হয়নি। নানা তত্ত্ব। এমনকি তিনসুকিয়া কাণ্ড মার্কামারা সরকারি গুপ্তহত্যা বলেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। সবই একে একে ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে।

৩১ ডিসেম্বর নাগরিকপঞ্জিতে অন্তর্ভুক্তির আবেদন ও আপত্তি জানানোর দিন শেষ হয়েছে। আর তার কয়েকদিনের মধ্যেই সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে পাস হয়ে গেল নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল। তবে, রাজ্যসভায় পেশ করা হল না। একই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, আপাতত আর কোনও রাজ্যে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি প্রস্তুতের কাজ হবে না। কিন্তু অসম সহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব, নাগরিকপঞ্জি ও নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল – এই চরম দ্বন্দ্বে দীর্ণ। সুখের কথা এটুকুই এই দ্বন্দ্ব অসম আন্দোলনের ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী রূপে হাজির হয়নি।

শেষ করা যাক অধ্যাপক শর্মার বক্তব্য দিয়েই, "সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্র জাত্যাহংকার – অভিন্ন দেহ এই যমজের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধজয়ের সংগ্রামে আমাদের অবতীর্ণ হতেই হবে।... ঘন মেঘে আচ্ছন্ন, প্রায়ান্ধকার এই কালে আশার কথা এই যে অসমিয়া লোকসমুদায় জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বিষয়ে হিংসার যাবতীয় প্ররোচনায় সাড়া দিতে অস্বীকার করেছেন। সব কিছু শেষ হয়ে যায়নি।

ব্যবহৃত গ্রন্থ, পত্রিকা ও সংবাদপত্র:

১। সুবীর চৌধুরী, ট্রাবলড পেরিফেরি, ক্রাইসিস অভ ইন্ডিয়াজ নর্থ ইস্ট, সেজ, ২০০৯।

২। ড. দেবব্রত শর্মা, অসমীয়া জাতিগঠন আরু জাতীয়-জনগোষ্ঠীগত অনুষ্ঠানসমূহ (১৮৭৩-১৯৬০), এতলব্য প্রকাশন, ২০০৭।

৩। সঞ্জয় হাজরিকা, রাইটস অভ প্যাসেজ, বর্ডার ক্রসিং, ইমাজিন্ড হোমল্যান্ডস, ইন্ডিয়াস ইস্ট এন্ড বাংলাদেশ, পেঙ্গুইন বুকস, ২০০০।

৪। সঞ্জয় হাজরিকা, স্ট্রেঞ্জার্স অভ দ্য মিস্ট, টেলস অভ ওয়ার এন্ড পিস ফ্রম ইন্ডিয়াস নর্থইস্ট, পেঙ্গুইন বুকস, ২০১১।

৫। সঞ্জয় হাজরিকা, স্ট্রেঞ্জার্স নো মোর, আলেফ বুক কোম্পানি, ২০১৮।

৬। সজল নাগ, এক ঢিলে দুই পাখি, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ অগস্ট, ২০১৮।

৭। দেবাশিস আইচ, আর ক'কটি উপত্যকা পেরোবেন কালীকিশোরেরা?, গ্রাউন্ড জিরো, অগস্ট ২০১৮।

৮। মিলন দত্ত, মাতৃভাষা-হারানো এক বিস্মৃত বাঙালির বৃত্তান্ত, আরেক রকম।

৯। প্রবীর কুমার তালুকদার, নর্থ-ইস্টার্ন ফোরে, ফ্রন্টলাইন, জুন ১০, ২০১৬।

১০। উদয়ন মিশ্র, ভিকট্রি ফর আইডেনটিটি পলিটিকস, নট হিন্দুত্ব ইন আসাম, ইপিডাবলিইউ, ২৮ মে, ২০১৬।

১১। সৌমিত্র বৈশ্য, আসাম চুক্তি, এনআরসি'র বিভীষিকা এবং ইতিহাসের প্রেক্ষাপট, শ্রমজীবী ভাষা, ১ মে, ২০১৮।

১২। দেবব্রত ঠাকুর, জয় এল আঁতে ঘা দিয়েই, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৮।

১৩। অনিন্দিতা দাশগুপ্ত, দ্য মিথ অভ দি আসামিজ বাংলাদেশি, হিমল সাউথএশিয়ান, প্রথম প্রকাশ অগস্ট ২০০০, পুনঃপ্রকাশ ৩১ জুলাই, ২০১৮।

এপিডিআর, চন্দননগর আয়োজিত ১৬ জুলাই, ২০১৮
'এনআরসি, জাতীয়তাবাদ ও গণবিপন্নতা' শীর্ষক
'ভূপেন সেন স্মারক বক্তৃতা'র পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত
বর্তমান প্রবন্ধটি।

সৌজন্য : গ্রাউন্ডজিরো.ইন